ফায়দা ঃ যেসব লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হন তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। সাধারণভাবে অবশ্য তাঁদের মৃত বলাও জায়েয। তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তা হল অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁদের বেশী অনুভূতি দেওয়া হয়। যেমন, মানুষের পায়ের গোঁড়ালি ও হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ—উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে ; কিন্তু গোঁড়ালির তুলনায় আঙ্গুলের অনুভূতি অনেক বেশী তীব্র, তেমনি সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরযখের জীবনে বহু গুণ বেশী অনুভূতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এমন কি শহীদের এ জীবনানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জড়দেহেও এসে পেঁৗছিয়ে থাকে। অনেক সময় তাঁদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না, জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে এবং সাধারণ মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাঁদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টিত হয় এবং তাঁদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে।

এ আয়াতের ক্ষেত্রে নবী-রসূলগণ শহীদগণের চাইতেও অনেক বেশী মর্তবার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও বাহ্যিক হুকুম-আহকামে তার কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। যথা---যাদের পরিত্যক্ত কোন সম্পদ বন্টন করার রীতি নেই, তাদের স্ত্রীগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারেন না।

মোটকথা, বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রসূলগণ, অতঃপর শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তি। অবশ্য কোন কোন হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আউলিয়া এবং নেককার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন. তাঁদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে তাঁরাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অন্যান্য নেককার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদা বেশী, তবে নেককারগণও শহীদের পর্যায়ভুক্ত হতে পারেন।

যদি কোন শহীদের লাশ মাটিতে বিনষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌র পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয়তো তার নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ শহীদের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোন শহীদের লাশ যদি মাটির নিচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠায় কোন সন্দেহ নেই, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কোরআনের আয়াতের মর্মার্থ এখানে টিকছে

না। কেননা মানুষের লাশ যে কেবলমাত্র মাটিতেই বিনষ্ট হয় তাই নয়। অনেক সময় ভূনিম্নস্থ অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোন কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনষ্ট হওয়া সম্ভব। নবী-রসূল ও শহীদগণের লাশ মাটিতে ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বোঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোন ধাতু কিংবা খনিজ পদার্থের প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না।

নবী-রসূলগণের পবিত্র দেহও যে সাধারণ মানব-দেহের মত বিভিন্ন উপকরণের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁদের দেহও অস্ত্রের আঘাত কিংবা ওষুধের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবান্বিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নবী-রসূলগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় শহীদগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবন বেশী শক্তিসম্পন্ন হতে পারে না। নবী-রসূলগণের জীবিত দেহে অস্ত্র এবং অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ কিংবা অন্য কোন উপাদানের প্রভাবে যদি শহীদের লাশে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা 'মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারে না'---এ হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না।

সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদের লাশ অধিককাল পর্যন্ত মাটির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়াকে তাঁদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দু'অবস্থাতেই হতে পারে। প্রথমত, চিরকাল জড়দেহ অবিকৃত থাকার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, অন্যান্যের তুলনায় অনেক বেশী দিন অবিকৃত থাকার মাধ্যমে। যদি বলা হয় যে, তাঁদের দেহও সাধারণ লোকের দেহের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে বেশী দিন অবিকৃত থাকে এবং হাদীসের দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয়েছে, তবে তাও অবাস্তব হবে না। যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না, সেহেতু কোরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে لَا تَشْعُرُونَ (তোমরা বুঝতে পার না,) বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হল এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মত অনুভূতি তোমাদের দেওয়া হয়নি।

বিপদে ধৈর্য ধারণ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বান্দাদের যে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার তাৎপর্য কোরআন وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ আয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে। কোন বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্য ধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা, হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশী হয়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্য ধারণ করা সহজ হতে পারে। এ উম্মত পরীক্ষায় সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে পর সমষ্টিগতভাবেই

তার পুরস্কার দেওয়া হবে; এ ছাড়াও সবরের পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ঠিক ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে।

বিপদে 'ইন্নালিল্লাহ্' পাঠ করা ঃ আয়াতে সবরকারিগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দোয়াটি পাঠ করে। কেননা, এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি অর্থের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তিলাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ
فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾

(১৫৮) নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বাঘরে হজ্জ বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু'টিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সেই আমলের সঠিক মূল্য দেবেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর মধ্যে وَإِذِ ابْتَلٰى إِبْرٰهِيمَ শুরু করে সুদীর্ঘ আলোচনায় কা'বার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গাদি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এর প্রথমে ছিল কা'বা শরীফ ইবাদতের স্থান হওয়া সংক্রান্ত আলোচনা এবং পরে ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া সম্পর্কিত বিবরণ। সে দোয়ার মাঝেই হযরত ইবরাহীম (আ) 'মানাসেক'-এর নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়ার জন্য নিবেদন করেছিলেন। আর এই 'মানাসেক'-এর মধ্যে হজ্জ এবং ওমরাহ্ও অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আলোচনায় বায়তুল্লাহ্কে কেবলায় পরিণত করে একদিকে থেকে ইবাদতের বিশেষ স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তেমনি হজ্জ ও ওমরাহ্র কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করে এর গুরুত্বকে আরো সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতেও বায়তুল্লায় হজ্জ এবং ওমরাহ্ পালন সম্পর্কিত অপর একটি প্রসঙ্গে---'সাফা' ও 'মারওয়ায় প্রদক্ষিণের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

'সাফা' এবং 'মারওয়া' বায়তুল্লাহ্ সন্নিহিত দু'টি পাহাড়ের নাম। হজ্জ কিংবা ওমরার সময় কা'বাঘর তওয়াফ করার পর এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াতে হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় 'সায়ী'। জাহিলিয়ত যুগেও যেহেতু এ সায়ীর রীতি প্রচলিত ছিল এবং তখন এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এজন্য মুসলমানদের কারো কারো মনে এরূপ একটা দ্বিধার ভাব জাগ্রত হয়েছিল যে, বোধ হয় এ 'সায়ী' জাহিলিয়ত যুগের কোন অনুষ্ঠান এবং ইসলাম যুগে এর অনুসরণ করা হয়তো গোনাহ্‌র কাজ।

কোন কোন লোক যেহেতু জাহিলিয়ত যুগে একে একটা অর্থহীন কুসংস্কার বলে মনে করতেন, সেজন্য ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁরা একে জাহিলিয়ত যুগের কুসংস্কার হিসাবেই গণ্য করতে থাকেন। এরূপ সন্দেহের নিরসনকল্পে আল্লাহ্ পাক যেভাবে বায়তুল্লাহ্ শরীফের কেবলা হওয়া সম্পর্কিত সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন, তেমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে বায়তুল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট আরো একটি সংশয়ের অপনোদন করে দিয়েছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সায়ী'র ব্যাপারে কোন দ্বিধা-সংশয় অন্তরে স্থান দিও না), নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া (এবং এতদুভয়ের মাঝে 'সায়ী' করা দ্বীনেরই একটা স্মরণীয় ঘটনা ও) আল্লাহ্‌র নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত (এবং দ্বীনের ঐতিহ্য। সুতরাং) যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌তে হজ্জ কিংবা ওমরাহ্ পালন করে তার উপর মোটেও গোনাহ হবে না (যেমন, তোমাদের মনে সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে) এ দু'য়ের মধ্যে সায়ী করাতে (তার চিরাচরিত পন্থা অনুসারে, এতে গোনাহ্ তো নয়ই; বরং সওয়াব হবে। কারণ, সায়ী শরীয়তের দৃষ্টিতেও একটা সৎকর্ম।) এবং (আমার নিয়ম হচ্ছে—) কোন ব্যক্তি যদি সানন্দচিত্তে কোন সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার (অত্যন্ত) কদর করে থাকেন। (এবং সেই সৎকর্ম সম্পাদনকারীর নিয়ত ও আন্তরিক নিষ্ঠা সম্পর্কে) খুব ভালভাবেই জানেন (সুতরাং এ নিয়মেই যারা সায়ী করে তাদের নিয়ত এবং ইখলাসের অনুরূপ সওয়াব বা প্রতিদান দেওয়া হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ شَعَائِرَ اللّٰهِ এখানে شعائر শব্দটি شعيرة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন বা নিদর্শন। شعائر الله—বলতে সেসব আমলকে বোঝায়, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনের নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

حج—এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য স্থির করা। কোরআন-সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের উদ্দেশ্যে গমন এবং সেখানে বিশেষ সময়ে বিশেষ ধরনের কয়েক আমল সম্পাদন করাকে বলা হয় হজ্জ।

عمرة—শব্দের আভিধানিক অর্থ দর্শন করা। শরীয়তের পরিভাষায় বায়তুল্লাহ্ শরীফে হাযির হয়ে তওয়াফ-সায়ী প্রভৃতি বিশেষ ধরনের কয়েকটি ইবাদত সম্পাদন করার নামই ওমরাহ্।

'সায়ী' ওয়াজিব ঃ হজ্ব, ওমরাহ্ এবং সায়ীর বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ্র কিতাবসমূহে আলোচিত হয়েছে।

'সায়ী' করা ইমাম আহমদ (র)-এর মতে সুন্নত, ইমাম মালিক (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র)-র মতে ফরয, ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে ওয়াজিব। যদি কোন কারণে তা ছুটে যায়, তবে একটা ছাগল জবাই করে কাফ্ফারা দিতে হবে।

উপরোক্ত আয়াতের শব্দবিন্যাস থেকে এরূপ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, আয়াতে তো 'সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে সায়ী করাতে গোনাহ্ হবে না' বলা হয়েছে। এর দ্বারা বড়জোর এটা একটা মোস্তাহাব কাজ বলে সাব্যস্ত হতে পারে, ওয়াজিব হওয়ার কারণ কি ?

এখানে বোঝা দরকার যে, لَا جُنَاحَ (অর্থাৎ, গোনাহ হবে না) কথাটা প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বলা হয়েছে। কেননা, প্রশ্ন ছিল, যেহেতু সাফা ও মারওয়াতে মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং জাহিলিয়ত যুগের লোকেরা সায়ীর মাধ্যমে সে মূর্তিরই পূজা-অর্চনা করতো, সেহেতু এ কাজটি হারাম হওয়া উচিত। এরূপ প্রশ্নের জবাবেই বলা হয়েছে যে, এতে কোন গোনাহ্ নেই। আর যেহেতু এটা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রবর্তিত সুন্নত, কাজেই কারো কোন বর্বরসুলভ আমল দ্বারা এটা গোনাহ্র কাজ বলে সাব্যস্ত হতে পারে না। প্রশ্নের জবাবে এরূপ বলাতে এ আমলটি ওয়াজিব হওয়ারও পরিপন্থী বোঝা যায় না।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ
بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ
يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا
فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

(১৫৯) নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য; কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও সে মমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারিগণেরও। (১৬০) তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে ও মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমিই তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (১৬১) নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত। (১৬২) এরা চিরকাল এ লানতের মাঝেই থাকবে। তাদের উপর থেকে আযাব কখনও হালকা করা হবে না এবং এরা বিরামও পাবে না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে কেবলার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে যাঁর কারণে বায়তুল্লাহ্ শরীফকে কেবলা হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে আহলে-কিতাবদের সত্য গোপন করার কথা আলোচিত হয়েছিল। এখানে اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ থেকে يَعْرِفُوْنَهٗ পর্যন্ত সে প্রসঙ্গটিরই পরিপূরক হিসাবে সত্য গোপনকারী এবং এ ব্যাপারে যারা বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিচ্ছে, তাদের শাস্তি ও তওবা করলে তা ক্ষমা করার ওয়াদার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেসব লোক সে সমস্ত তথ্য গোপন করে, যা আমি নাযিল করেছি (এবং) যেগুলো (নিজে নিজেই) অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং (অন্যদের জন্যও) পথপ্রদর্শক (এবং এ গোপন করাও এমন অবস্থায়) যখন আমি (এ সব তথ্য) কিতাবে (তওরাত ও ইঞ্জীলে নাযিল করে) সাধারণ লোকদের জন্য প্রকাশ করে দিয়েছি, এ সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অভিসম্পাত করেন (খাস রহমত থেকে তাদের বঞ্চিত করে দেন) এবং (অন্যান্য অনেক) অভিসম্পাতকারীও (যারা এরূপে ঘৃণ্য কাজ অপছন্দ করে) তাদের প্রতি অভিশাপ প্রেরণ করে (তাদের প্রতি বদ-দোয়া করে।) কিন্তু (এসব গোপন-কারীদের মধ্য থেকে) যেসব লোক (তাদের সে সমস্ত ঘৃণ্য কাজ থেকে) তওবা করে (আল্লাহ্‌র সামনে অতীতের সেসব ক্রিয়া-কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে) এবং যা কিছু করেছে (এবং তাদের সে দুষ্কর্মের দ্বারা যে সব অনাচার হয়ে গেছে, পরবর্তী সময়ের জন্য সে সবের) সংশোধন করে (সে সংশোধনের পন্থা হচ্ছে গোপন করা সেসব তথ্য) প্রকাশ করে দেয় (যেন সবাই তা জানতে পারে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার দায়িত্ব অবশিষ্ট না থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ প্রকাশ করা তখনই

গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। কেননা, ইসলাম কবুল না করা পর্যন্ত সর্বসাধারণের নিকট প্রকৃত সত্য গোপনই থেকে যাবে। তারা মনে করবে যে, যদি মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত সত্যই হতো, তবে এসব আহ্‌লে-কিতাব, (যারা তাদের কিতাবসমূহে তাঁর আবির্ভাবের সুসংবাদ পাঠ করেছে, তারা) অবশ্যই ইসলাম কবুল করত। (মোটকথা, যে পর্যন্ত তারা মুসলমান না হয়, সে পর্যন্ত তওবা কবুল হবে না।) তবে এসব লোকের প্রতি আমি (অনুগ্রহ করে) মনোযোগ প্রদান করি (এবং তাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেই)। আমার নিয়মই হচ্ছে তওবা কবুল করা ও অনুগ্রহ করা। (তবে সত্যিকার অর্থে তওবাকারী হওয়া চাই)। অবশ্য (এদের মধ্য থেকে) যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করবে না এবং ইসলাম গ্রহণ না করা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের লা'নত (এমনভাবে বর্ষিত হবে যে) ওরা চিরকালই এতে (অভিশাপে পতিত) থাকবে। (মোটকথা, এরা চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যারা চির-জাহান্নামী তারা সব সময়ের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে। চিরঅভিশপ্ত থাকার অর্থই তাই। উপরন্তু জাহান্নামে প্রবেশ করার পর কোন সময়ই) তাদের উপর থেকে (জাহান্নামের) আযাব হালকা হবে না এবং (প্রবেশ করার আগেও) তাদেরকে সামান্য সময়ের জন্যও বিরাম দেওয়া হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইলমে-দ্বীনের প্রকাশ ও প্রচার করা ওয়াজিব এবং গোপন করা হারাম ঃ উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যে সমস্ত প্রকৃষ্ট হেদায়েত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও লা'নত বা অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায় ঃ

প্রথমত, যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরী, তা গোপন করা হারাম। রসূলে-করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار -

---"যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের ইলম জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।"---হাদীসটি হযরত আবু-হোরায়রা ও আমর ইবনে আস (রা) থেকে ইবনে মাজাহ রেওয়ায়েত করেছেন।

ফিকহ্‌বিদগণ বলেছেন, এ অভিসম্পাত আরোপিত হবে তখনই, যখন অন্য কোন লোক সেখানে উপস্থিত থাকবে না। যদি অন্যান্য আলেম লোকও সেখানে

উপস্থিত থাকেন, তবে একথা বলে দেওয়া যেতে পারে যে, অন্য কোন আলেমকে জিজ্ঞেস করে নাও —(কুরতুবী, জাস্‌সাস)

দ্বিতীয়ত, এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন বিষয়ে যার যথাযথ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান নেই, তার পক্ষে মাস'আলা-মাসায়েল ও হুকুম-আহ্‌কাম বলার দুঃসাহস করা উচিত নয়।

তৃতীয়ত, জানা যায় যে, 'জ্ঞানকে গোপন করার' অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাস'আলা গোপন করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহ্‌য় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল মাস'আলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যদ্দ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা كتمان علم বা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লিখিত আয়াতে مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তেমনিভাবে মাস'আলা-মাসায়েল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমন সব হাদীস শোনাও যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেতনা-ফাসাদেরই সম্মুখীন করবে। —(কুরতুবী)

সহীহ্‌ বোখারীতে হযরত আলী (রা) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, "সাধারণ মানুষের সামনে ইলমের শুধুমাত্র ততটুকু প্রকাশই করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বরদাশত করতে পারে। মানুষ আল্লাহ্‌ ও রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক; তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যে কথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানারকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ্‌ ও রসূলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যাদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তব্য উপস্থাপন করা হবে, তাদের অবস্থার অনুপাতে কথা বলাও আলেমের একটি অন্যতম দায়িত্ব। যাদের পক্ষে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে, তাদের সামনে এমন মাস'আলা-মাসায়েল বর্ণনা করবে না। সে জন্যই বিজ্ঞ ফিকহ্‌বিদগণ বহু বিষয় বর্ণনাশেষে লিখে থাকেন—هٰذَا مِمَّا يُعْرَفُ وَلَا يُعْرَفُ —অর্থাৎ, 'এ বিষয়টি এমন যা আলেমগণ জেনে নেবেন, কিন্তু সাধারণ্যে প্রচার করবেন না। অর্থাৎ তা উচিত হবে না।

এক হাদীসে রসূলে-করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لا تمنعوا الحكمة اهلها فتظلموهم ولا تضعوها فى غير اهلها فتظلموها ـ

অর্থাৎ নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয়সমূহ এমন লোকদের কাছে গোপন করবে না, যারা তার পূর্ণ যোগ্য। যদি তোমরা এমন কর, তাহলে তা মানুষের উপর জুলুম হবে।

পক্ষান্তরে যারা যোগ্য নয়, তাদের সামনে হেকমত বা সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করবে না। কারণ, এটাই হবে সে বিষয়ের উপর জুলুম।

ইমাম কুরতুবী বলেন, এই বিশ্লেষণে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, কোন কাফির যদি মুসলমানের বিরুদ্ধে তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হয় কিংবা কোন বিদ'আতপন্থী যদি মানুষকে নিজের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার প্রতি আমন্ত্রণ জানায়, তবে তাদেরকে দ্বীনের ইল্‌ম শেখানো ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, যতক্ষণ না স্থির বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ইলম শিক্ষা করার পর তাদের ধ্যান-ধারণা বিশুদ্ধ হবে।

তেমনিভাবে কোন বাদশাহ কিংবা শাসককে এমন বিষয়াদি বাতলে দেওয়া জায়েয নয়, যেগুলোর মাধ্যমে সে প্রজা-সাধারণের উপর উৎপীড়নের পন্থা উদ্ভাবন করতে পারে। তেমনিভাবে সাধারণ লোকদের সামনে ধর্মীয় বিধি-বিধানের 'হিলা' বা বিকল্প পন্থাসমূহের দিকগুলো বিনা কারণে বর্ণনা করাও বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, তাতে মানুষ দ্বীনী হুকুম-আহ্‌কামের ব্যাপারে নানা রকম ছল-ছুতার অন্বেষণে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে।—(কুরতুবী)

রসূলে করীম (সা)-এর হাদীসও কোরআনের হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, 'যদি কোরআনের 'আয়াত' না থাকত, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না।' এখানে আয়াত বলতে সে সমস্ত আয়াতকে বোঝানো হয়েছে, যাতে ইলম গোপন করার ব্যাপারে কঠোর অভিসম্পাত করা হয়েছে। এমনিভাবে অন্যান্য সাহাবীর মধ্যেও অনেকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে এমনি ধরনের কথা বলেছেন যে, ইল্‌ম গোপন করার ব্যাপারে যদি কোরআনের এ আয়াতটি না থাকত, তাহলে আমি এ হাদীস বর্ণনা করতাম না।

কাজেই এসব রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের নিকট রসূলে করীম (সা)-এর হাদীসও কোরআনের হুকুমেরই অনুরূপ ছিল। কারণ, আয়াতে গোপন করার ব্যাপারে সে সমস্ত লোকের প্রতিই অভিসম্পাত করা হয়েছে, যারা অবতীর্ণ সুস্পষ্ট ও প্রকৃষ্ট হেদায়েতসমূহ গোপন করবে। হাদীসে তার পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু সাহাবাগণ রসূলে করীম (সা)-এর হাদীসসমূহকেও কোরআনের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, তা গোপন করাকেও অভিসম্পাতযোগ্য বলে ধারণা করেছেন।

কোন্ কোন্ পাপের জন্য সমগ্র সৃষ্টি লা'নত করে ঃ —وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ

আয়াতে কোরআনে-করীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি, কারা লা'নত করে! তফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) বলেছেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। এমনকি জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। কারণ, তাদের অপকর্মের দরুন সে সব সৃষ্টিরও ক্ষতি সাধিত হয়। হযরত বারা' ইবনে আযেব (রা) বর্ণিত এক হাদীসেও

তার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে রসূলে করীম (সা) বলেছেন, اَللَّاعِنُوْنَ -এর অর্থ হল সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণশীল সমস্ত জীব। (—কুরতুবী)

কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি লা'নত করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, যতক্ষণ না তার কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণের বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায়ঃ وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ—বাক্যাংশের দ্বারা জাস্‌সাস ও কুরতুবী প্রমুখ উদ্ভাবন করছেন যে, যে কাফির কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারও শেষ পরিণতির (মৃত্যুর) নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু কোন কাফিরের নাম নিয়ে, তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েয নয়। বস্তুত রসূলে করীম (সা) যে সমস্ত কাফিরের নামোল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাফির ও জালেমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা জায়েয।

এতে একথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন কাফিরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোন মুসলমান কিংবা কোন জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ, বিশেষত, আমাদের নারী সম্প্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে। তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও অভিসম্পাত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসুর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হল, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। কাজেই কাউকে 'মরদুদ', 'আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত' প্রভৃতি শব্দে গালি দেওয়াও লা'নতেরই সমপর্যায়ভুক্ত।

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ

النَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ

بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

(১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য, একই মাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা-করুণাময় দয়ালু কেউ নেই! (১৬৪) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীবজন্তু। আর আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে— নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।

যোগসূত্র ঃ আরবের মুশরিকরা যখন নিজেদের বিশ্বাসের পরিপন্থী আয়াত وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ শুনল, তখন বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, সারা বিশ্বেরই কি একজন মাত্র উপাস্য হতে পারে? যদি এ দাবী যথার্থ হয়ে থাকে, তবে তার কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তারই প্রমাণ পেশ করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যে (সত্তা) তোমাদের সবার উপাস্য হওয়ার যোগ্য, তিনিই তো একমাত্র (ও প্রকৃত) উপাস্য। তাঁকে ছাড়া উপাসনার যোগ্য কেউ নেই। তিনিই মহান করুণাময় দয়ালু। (তা'ছাড়া আর কেউই এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ নেই। আর গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরাকাষ্ঠা ব্যতীত উপাস্য হওয়ার অধিকারও বাতিল হয়ে যায়। কাজেই, একমাত্র ও প্রকৃত উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয়)। নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে একের পর এক করে রাত-দিনের আগমনে এবং সাগর-সমুদ্রের বুকে (মানুষের জন্য কল্যাণকর বিষয় নিয়ে) জাহাজসমূহের চলাচল, মেঘের পানিতে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে বর্ষণ করে থাকেন এবং অতঃপর সে (পানির) দ্বারা যমীনকে উর্বর করেন, তার শুকিয়ে যাওয়ার পর (অর্থাৎ তাতে শস্যরাজি উৎপন্ন করেন) এবং (সে শস্যের দ্বারা) সর্বপ্রকার জীবকে এই (যমীনে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। (কারণ, জীব-জন্তুর জীবন ও বংশবৃদ্ধি এই খাদ্যশস্যের দৌলতে বাস্তবায়িত হয়)। আর আবহাওয়ার (দিক ও অবস্থার) বিবর্তন (অর্থাৎ কখনও পুবাল কখনও পশ্চিমা) মেঘমালার অস্তিত্বে যা আসমান-যমীনের মাঝে বিদ্যমান থাকে, এ সমস্ত

বিষয়েই (তওহীদ বা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের) প্রমাণ রয়েছে সে সমস্ত লোকের জন্য যারা (কোন বিষয় প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের) সুষ্ঠু বিবেকের অধিকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তওহীদের মর্মার্থ ঃ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ বিভিন্নভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ বা একত্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে। উদাহরণত তিনি একক, সমগ্র বিশ্বের বুকে তাঁর না কোন তুলনা আছে, না তাঁর কোন সমকক্ষ আছে। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

দ্বিতীয়ত---উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক। অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া অন্য আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়।

তৃতীয়ত---সত্তার দিক দিয়ে তিনি একক। অর্থাৎ অংশ-বিশিষ্ট নন। তিনি অংশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। তাঁর বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না।

চতুর্থত---তিনি তাঁর আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন, যখন অন্য কোন কিছুই ছিল না এবং তখনও বিদ্যমান থাকবেন, যখন কোন কিছুই থাকবে না। অতএব, তিনিই একমাত্র সত্তা যাকে واحد বা 'এক' বলা যেতে পারে। وَاحِدٌ শব্দটিতে উল্লিখিত যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান রয়েছে।

---(জাস্‌সাস)

তারপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতার এবং একত্ব-বাদের প্রকৃত প্রমাণ। এসব বিষয়ের সৃষ্টি ও অবস্থিতিতে অপর কারও হাত নেই।

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, এমন তরল ও প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণ-ভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পিছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি সম্ভব হতো না, তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারতো না; এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হতো না। এ বিষয়টিই কোরআনে হাকীম এভাবে উল্লেখ করেছে ঃ

إِنْ يَّشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং তখন এ সমস্ত জাহাজ সাগরপৃষ্ঠে 'ঠাঁয়' দাঁড়িয়ে যাবে।"

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানী-রফতানী করার মাঝেও মানুষের এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে, যা গণনাও করা যায় না। আর এ উপকারিতার ভিত্তিতেই যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোন কিছুর ক্ষতি সাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোন মানুষ, জীবজন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ছ'মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথক ভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর কোনক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ۝

অর্থাৎ "আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।"

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে বিশ্বাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত খাদ-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির ভিতরে পেঁৗছে দিয়েছেন। তারপর এমন এক ফল্গুধারা সমগ্র যমীনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যে কোন খানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এই পানিরই একটা অংশকে জমাট বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত; অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝরনাধারার নহরের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সারকথা---উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তওহীদ বা একত্ববাদ প্রমাণ করা হয়েছে। তফসীরকার আলেমগণ এ সমস্ত বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।---(জাস্সাস, কুরতুবী প্রভৃতি তফসীরগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

যোগসূত্র ঃ উল্লিখিত আয়াতে তওহীদের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছিল। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্তি এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

(১৬৫) আর কোন লোক এমনও রয়েছে, যারা অন্যান্যকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হ'ত যদি এ জালিমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য এবং আল্লাহ্‌র আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অনেক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌কে ছাড়াও তাঁর খোদায়িত্বে অন্যদের শরীক সাব্যস্ত করে (এবং তাদেরকে নিজের নিয়ন্তা মনে করে)। আর তাদের সাথেও তেমনিভাবে ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা (শুধুমাত্র) আল্লাহ্‌র সাথেই (পোষণ করা) কর্তব্য। (এ তো গেল মুশরিকদের অবস্থা) আর যারা ঈমানদার (একমাত্র) আল্লাহ্‌র সাথেই রয়েছে তাদের গভীর ভালবাসা এবং সে ভালবাসা ওদের ভালবাসার তুলনায় বহুগুণ বেশী। (কারণ, কোন মুশরিকের কাছে যদি একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আমার উপাস্যের পক্ষ থেকে আমার কোন ক্ষতি বা অকল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে সাথে সাথেই তার সে ভালবাসা রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মু'মিনরা আল্লাহ্‌কেই কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তথাপি তার ভালবাসা ও সন্তুষ্টিতে কোন পরিবর্তন দেখা দেয় না। এছাড়া অধিকাংশ মুশরিক কঠিন বিপদাপদের সময় নিজেদের কাল্পনিক উপাস্যদের পরিহার করে বসে। কিন্তু কোন মু'মিন কখনও কোন বিপদে আল্লাহ্‌কে পরিহার করে না। (আর পরীক্ষিতভাবেও এ ধরনের পরিস্থিতিতে এ অবস্থার সত্যতা প্রমাণিত)। আর কতইনা উত্তম হত! যদি এই জালিমরা

(অর্থাৎ মুশরিকরা এ পৃথিবীতেই) কোন কোন বিপদাপদ (ও তার ভয়াবহতা) দেখে (এবং সেগুলোর সংঘটনের বিষয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করে একথা) উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে! (আর অন্যান্য সব কিছুই তাঁর সামনে অক্ষম। কাজেই এ বিপদাপদকে না অপর কেউ বাধা দিতে পেরেছে, না দূর করতে পেরেছে, আর নাইবা এমন বিপদাপদের সময় অন্য কারো কথা স্মরণ থাকে)। আর তারা যদি এহেন কঠিন বিপদের বিষয় উপলব্ধি করে) একথা বুঝে নিত, তাহলে কতইনা উত্তম ছিল যে) আল্লাহ্ তা'আলার আযাব আখেরাতের বিচারদিনে আরও কঠিন হবে! (এভাবে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করলে তাদের সামনে স্বহস্তে নির্মিত উপাস্যদের অক্ষমতা এবং আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও মাহাত্ম্য প্রতিভাত হয়ে যেত এবং তাতে করে তারা ঈমান গ্রহণ করে নিত)।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَ
تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ
لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ
أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

(১৬৬) অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক (১৬৭) এবং অনুসারীরা বলবে, কতইনা ভাল হত, যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেওয়া হত! তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্য। অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

যোগসূত্র ঃ উপরে আখেরাতের আযাবকে অতি কঠিন বলা হয়েছে। আর এখানে সেই কঠোরতার প্রকৃতি বর্ণনা করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আযাবের সেই কঠোরতা তখন অনুভূত হবে) যখন (মুশরিকদের) সে সমস্ত (প্রভাবশালী) লোকেরা সাধারণ লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে, যাদের কথামত

সাধারণ লোকেরা চলত এবং (সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে) যখন সবাই আযাবের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে নেবে আর তাদের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক ছিল, তাও ছিন্ন হয়ে যাবে (যেমনটি পৃথিবীতেও দেখা যায় যে, কোন অপরাধে সবাই সমানভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও মামলার বিচার ক্ষেত্রে সবাই পৃথক পৃথকভাবে আত্মরক্ষা করতে চায়। এমনকি একে অপরের সাথে পরিচিত বলেও অস্বীকার করে বসে)। আর (যখন এ সমস্ত অনুগামী লোকেরা নেতৃবর্গের এহেন বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। কিন্তু তাতে আর কিছু না হলেও তারা উত্তেজিত হয়ে) বলতে আরম্ভ করবে, (কোনক্রমে) আমাদের (সবাইকে একটিবার) যদি পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়, তা'হলে আমরাও তাদের থেকে (অন্তত এটুকু প্রতিশোধ তো অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব যে, তারা যদি আবার আমাদেরকে তাদের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করে, তবে আমরাও পরিষ্কার কাটা উত্তর দিয়ে) তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাব, যেমন করে তারা (এখন) আমাদের থেকে পরিষ্কারভাবে পৃথক হয়ে গেছে। (আর বলে দেব যে, তুমিই তো সে লোক, যে যথাসময়ে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলে। কাজেই এখন আমাদের এখানে আর কোন্ মতলবে)?

(আল্লাহ্ বলেন, এসব চিন্তা-ভাবনা আর প্রস্তাবনায় কি হবে!) আল্লাহ্ তা'আলা এমনি করে তাদের অসৎ কর্মগুলোকে অপার আকাঙ্ক্ষার (আকারে) দেখিয়ে দেবেন এবং তাদের (নেতৃবর্গ ও অনুসারী) কারোই দোযখের আগুন থেকে পরিত্রাণ ভাগ্যে জুটবে না (কারণ শিরকের শাস্তিই হল অনন্তকাল দোযখ ভোগ)।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟
خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم
بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

(১৬৮) হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৯) সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন সব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর, যা তোমরা জান না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কোন কোন মুশরিক দেব-দেবীর নামে গৃহপালিত পশু ছেড়ে দিয়ে এবং তাতে কল্যাণ সাধিত হবে বলে বিশ্বাস করে সেগুলোর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করত। তারা নিজেদের এহেন কাজকে আল্লাহ্র নির্দেশ, তাঁর সন্তুষ্টির কারণ এবং

সমস্ত দেব-দেবীর সুপারিশক্রমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ হবে বলে বিশ্বাস করত। এ প্রসঙ্গেই এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন) হে মানব মণ্ডলী! যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে সেগুলোর মধ্যে (শরীয়তের বিধান মতে) হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর (এবং ব্যবহার কর! তোমাদের প্রতি এ অনুমতি রয়েছে)। আর (এসব হালাল বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে কোনটি থেকে এই মনে করে বিরত থাকা যে, তাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন, তাও শয়তানী ধারণা। কাজেই তোমরা) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না। প্রকৃতপক্ষে সে (অর্থাৎ শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সে তোমাদেরকে এমনি সমস্ত কু-ধারণা, অলীক কল্পনা ও মূর্খতার মাধ্যমে অন্তহীন ক্ষতির আবর্তে বন্দী করে রাখে। আর শত্রু হওয়ার কারণে) সে তোমাদিগকে সে সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা দেবে, যা (শরীয়তের দৃষ্টিতে) মন্দ ও অপবিত্র। তদুপরি এমন শিক্ষাও দেবে যে, আল্লাহর ওপর এমন বিষয়েও মিথ্যা আরোপ কর, যার সনদ পর্যন্ত তোমাদের জানা নেই। (যেমন, মনে করে নেওয়া যে, আমাদের প্রতি উল্লিখিত ব্যাপারে আল্লাহ্র হুকুম রয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ حَلَّ — حَلَالًا طَيِّبًا শব্দের প্রকৃত অর্থ হল গিট খোলা। যেসব বস্তু-সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেওয়া হয়েছে, তাতে যেমন একটা গিটই খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলার উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হযরত সাহ্ল ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। (১) হালাল খাওয়া, (২) ফরয আদায় করা এবং (৩) রসূলে করীম (সা)-এর সুন্নতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। طَيِّبْ শব্দের অর্থ পবিত্র। শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তু-সামগ্রীও এরই অন্তর্ভুক্ত।

خُطُوَاتٌ (খুতুওয়াত) خُطْوَةٌ (খুত্ওয়াতুন)-এর বহুবচন। خُطْوَةٌ বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সুতরাং خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ-এর অর্থ হচ্ছে শয়তানী কাজকর্ম।

سُوْءٌ — اَلسُّوْءُ وَالْفَحْشَاءُ বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন বুদ্ধিমান লোক দুঃখ বোধ করে। فحشاء অর্থ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে سوء এবং فحشاء এর মর্ম

যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ। অর্থাৎ—অসাধারণ গোনাহ্ এবং কবীরা গোনাহ্।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ —এখানে শয়তানের নির্দেশদান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওয়াস্ওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্উদ (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—আদম সন্তানদের অন্তরে একাধারে শয়তানী প্রভাব এবং ফেরেশতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। শয়তানী ওয়াস্ওয়াসার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের ইলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

মাস'আলা ঃ দেব-দেবীর নামে ষাঁড় বা অন্য কোন জীবজন্তু, মোরগ-মুরগী, ভেড়া-বকরী ছাড়া কিংবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তি অথবা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা যে হারাম তাই পরবর্তী চার আয়াতের পর وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ এর আওতায় বর্ণনা করা হবে। বর্তমান يَا أَيُّهَا النَّاسُ আয়াতে এ ধরনের জীব-জন্তুর হারাম হওয়ার বিষয়টিকে নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়, যেমন অনেকেরই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। বরং এখানে এ ধরনের কার্যকলাপ হারাম হওয়ার বিষয় বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী মুক্ত করা এবং এ কাজকে নৈকট্য ও বরকতের বিষয় বলে ধারণা করা আর এ সমস্ত জীব-জন্তুকে নিজের জন্য হারাম বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং এগুলোকে চিরস্থায়ী মনে করা প্রভৃতি কাজ নাজায়েয এবং এমন কাজ করা পাপ।

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, যেমন জীব-জন্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে দেব-দেবীর নাম করে হারাম সাব্যস্ত করো না। বরং সেগুলোকে যথারীতি ভক্ষণ কর। অবশ্য অজ্ঞানতার দরুন যদি এমন কোন কাজ সংঘটিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে নিয়ত সংশোধনের সাথে সাথে ঈমানও নবায়ন করবে এবং তওবা করে নিয়ে এই অবৈধতাকে নষ্ট করে দেবে। এভাবে এ সমস্ত জীব-জন্তুকে পবিত্র কিছু মনে করে হারাম সাব্যস্ত করাও পাপ, কিন্তু এগুলোকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করার দরুন বিধানগতভাবে যেহেতু নাপাক বলে গণ্য হয়ে যায়, তাই সেগুলোর হারাম হওয়াও প্রমাণিত হয়ে যায়।

মাস'আলা ঃ এতে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞতা কিংবা অসতর্কতার দরুন কোন জীবকে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোন কিছুর নামে মুক্ত করে দেয়, তাহলে এই হারাম ধারণা বর্জন করে এহেন কাজ থেকে তওবা করে নেবে। তাহলেই সে জীবের মাংস হালাল হয়ে যাবে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ
مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ
الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ
عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

(১৭০) আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর, যা আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে—কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি! যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। (১৭১) বস্তুত এহেন কাফিরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোন জীবকে আহবান করছে যা কোন কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া—বধির, মূক এবং অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বুঝে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যখন কেউ সেসব (মুশরিক) লোককে বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে নির্দেশ (স্বীয় পয়গম্বরের প্রতি) নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী চল, তখন (তারা উত্তরে) বলে, (তা হতে পারে না;) আমরা তো বরং সে পথেই চলব, যে পথে আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। (কারণ, তারাও সে পথ অবলম্বনের ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত ছিলেন। এ দাবীর খণ্ডনে আল্লাহ্ বলেন) তারা কি সর্ববিষয়েই স্বীয় বাপ-দাদাদের পন্থায় চলবে; তাদের বাপ-দাদারা ধর্মীয় ব্যাপারে কোন কিছু না জানলেও কি এবং তাদের প্রতি কোন আসমানী গ্রন্থের হেদায়েত না থাকলেও কি?

বস্তুত (অজ্ঞানতার ক্ষেত্রে) এ সমস্ত কাফিরের তুলনা সে সমস্ত জীব-জন্তুর অবস্থারই মত (যার কথা এ উদাহরণে বর্ণনা করা হচ্ছে) যে, এক লোক এমন এক জীবের পেছনে পেছনে চিৎকার করে যাচ্ছে যে, হাঁক-ডাক আর চিৎকার (-এর শব্দ) ছাড়া তার কোন মর্মই শোনে না। (তেমনিভাবে) এ কাফিররাও (বাহ্যিক কথাবার্তা

শোনে বটে, কিন্তু কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ) বধির (যেন কিছুই শোনে না), মূক (যেন এমন কোন কথাই তাদের মুখে সরে না), অন্ধ (কারণ, লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না)। কাজেই (তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যখন বিকল, তখন) তারা কোন কিছুই বুঝে না, উপলব্ধি করে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্য কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন, দু'টি শব্দে বলা হয়েছে—لَا يَهْتَدُونَ এবং لَا يَعْقِلُونَ—এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোন খোদায়ী হেদায়েত। হেদায়েত বলতে সে সমস্ত বিধি-বিধানকে বোঝায়, যা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। আর জ্ঞানবুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, যা শরীয়তের প্রকৃষ্ট 'নস' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়।

অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হল এই যে, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোন বিধি-বিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর পর্যালোচনা গবেষণা করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করে নেওয়ার মত কোন যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন আলেমের ব্যাপার এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে কোরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞানের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে ইজতিহাদ (উদ্ভাবন)-এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন-মুজতাহিদ আলেমের আনুগত্য অনুসরণ করা জায়েয। অবশ্য এ আনুগত্য তাঁর ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্য নয়, বরং আল্লাহ্ এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মানার জন্যই হবে। যেহেতু আমরা সরাসরি আল্লাহ্র সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারি না, সেহেতু কোন মুজতাহিদ আলেমের অনুসরণ করি, যাতে করে আল্লাহ্র বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করা যায়।

অন্ধ অনুসরণ এবং মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্যঃ উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন, তারা নিজেরাই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নন।

এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, এ আয়াতে যে পূর্বপুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম হল ভ্রান্ত ও মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা পূর্ব-পুরুষের অনুসরণ। যথার্থ ও সঠিক বিশ্বাস ও সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, সূরা

ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সংলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ দু'টি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ -

—"আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-এর ধর্মবিশ্বাসের।"

এ আয়াতের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা হারাম, কিন্তু বৈধ ও সৎকর্মের বেলায় তা জায়েয। বরং প্রশংসনীয়।

ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজতাহিদ ইমামগণের আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কিত মাস'আলা-মাসায়েল এবং অন্যান্য বিধি-বিধানেরও উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন ঃ

تعلق قوم بهذه الاية فى ذم التقليد (الى) وهذا فى الباطل صحيح - اما التقليد فى الحق فاصل من اصول الدين وعصمة من عصم المسلمين يلجاء اليها الجاهل المقصر عن درك النظر -

অর্থাৎ "কিছু লোক এ আয়াতটিকে তকলীদ বা অনুসরণের নিন্দাবাদ প্রসঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। তবে এরূপ অনুসরণ করা কেবল অবৈধ ও বাতিল বিষয়ের ক্ষেত্রেই যথার্থ। কিন্তু সত্য-সঠিক বিষয়ে কারও অনুসরণের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সত্য-সঠিক বিষয়ে (অন্যের) অনুসরণ করা তো বরং ধর্মীয় নীতিমালার একটা স্বতন্ত্র ভিত্তি এবং মুসলমানদের জন্য ধর্মের হেদায়েত লাভের একটা বড় উপায়। কারণ, যারা নিজেরা ইজতিহাদ বা উদ্ভাবনের যোগ্যতা রাখে না, ধর্মীয় ব্যাপারে অন্যের অনুসরণের উপরই তাদের নির্ভর করতে হয়।"—(কুরতুবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ

اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

(১৭২) হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহ্‌র, যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর। (১৭৩) তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালংঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরের আয়াতে পবিত্র বস্তু-সামগ্রী খাবার ব্যাপারে মুশরিকদের ভুল ধারণা বাতলে দিয়ে তাদের সংশোধন করা উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীতে ঈমানদারদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, যেন তারা সে ভুল ধারণার ক্ষেত্রে মুশরিকদের মতই আচরণ আরম্ভ না করে। প্রসঙ্গক্রমে ঈমানদারদের প্রতি স্বীয় নেয়ামতের উল্লেখ করে তাদেরকে শুকরিয়া আদায় করার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ)

হে ঈমানদারগণ (আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি এ অনুমতি রয়েছে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে) যেসব পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আমি তোমাদেরকে দান করেছি, সেগুলোর মধ্য থেকে তোমরা (যা খুশী) আহার কর, (ভোগ কর) এবং (এ অনুমতির সাথে সাথে এ নির্দেশও বলবৎ রয়েছে যে, মুখ, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপে এবং এ সমস্ত নেয়ামত যে একান্তই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদত্ত সে বিষয়ে অন্তরে বিশ্বাস রাখার মাধ্যমে) আল্লাহ্‌ তা'আলার শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা বাস্তবিকপক্ষেই তাঁর দাসত্বের সাথে যুক্ত থেকে থাক। (বস্তুত এ সম্পর্ক একান্তই স্বীকৃত প্রকাশ্য। সুতরাং শুকরিয়া আদায় করাও যে ওয়াজিব তাও সুপ্রমাণিত।)

যোগসূত্র ঃ উপরের আলোচনায় বলা হচ্ছিল যে, হালাল বা বৈধ বস্তু-সামগ্রীকে হারাম বা অবৈধ সাব্যস্ত করো না। তারপর বলা হচ্ছে যে, মুশরিকদের মত তোমরাও হারামকে হালাল মনে করো না। এখানে মৃত বা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা জীব-জন্তু যা মুশরিকরা খেত---তা থেকে বারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকট অমুক অমুক জীব হারাম। এগুলো ছাড়া অন্যান্য জীব-জন্তুকে নিজের পক্ষ থেকে হারাম সাব্যস্ত করা ভুল। এতে পূর্ববর্তী বিষয়েরও সমর্থন হয়ে গেল।

(অতঃপর বলা হচ্ছে,) আল্লাহ্ তা'আলা (শুধু) তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জীব, (যা জবাই করা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও জবাই করা ছাড়া মরে যায়)। আর রক্ত (যা প্রবাহিত হয়) এবং শূকর মাংস (তেমনি তার অন্যান্য অংশগুলোও) আর এমন সব জীব-জন্তু যা (আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মানসে) আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। (এ সমস্ত আল্লাহ্ হারাম করেছেন, কিন্তু সে সব বস্তু হারাম করেন নি, যা তোমরা নিজের পক্ষ থেকে হারাম করে নিচ্ছ। যেমন, উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)। তবে অবশ্য (এতে এতটুকু অবকাশ রয়েছে যে,) যে লোক (ক্ষুধার জ্বালায়) অনন্যোপায় হয়ে পড়ে (তার পক্ষে তা খাওয়ায়) কোন পাপ নেই। অবশ্য শর্ত হল এই যে, খেতে গিয়ে সে যেন স্বাদ গ্রহণে আগ্রহী না হয় (প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে গিয়ে) যেন সীমালংঘন না করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু (তিনি এমন চরম সময়ে রহমত করে গোনাহ্র বস্তু থেকেও গোনাহ্ রহিত করে দিয়েছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হালাল খাওয়ার বরকত ও হারাম খাদ্যের অকল্যাণ ঃ আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ, হারাম খেলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও অসচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, ইবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দোয়া কবুল হয় না, তেমনিভাবে হালাল খাওয়ায় অন্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয়। তদ্দ্বারা অন্যায়-অসচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ; ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দোয়া কবুল হয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি হেদায়েত করেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ○

"হে আমার রসূলগণ ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।"

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোয়া কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশঙ্কাই থাকে বেশী। রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দু'হাত তুলে আল্লাহ্র দরবারে বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদেগার ! ইয়া রব !!' কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে?---(মুসলিম, তিরমিযী,---ইবনে-কাসীর-এর বরাতে)

إِنَّمَا حَرَّمَ... বাক্যের মধ্যে إِنَّمَا শব্দটি বাক্যের অর্থ সীমিতকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা শুধুমাত্র সে-সমস্ত বস্তু-সামগ্রী হারাম করেছেন, যেগুলো পরে উল্লিখিত হচ্ছে এমনি, পরবর্তী অন্য এক আয়াতে বিষয়টির আরো একটু ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা ঃ

قُلْ لَّآ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ

অর্থাৎ, হুযুর (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে---আপনি ঘোষণা করে দিন, "ইতিপূর্বে আমি ওহী মারফত যেসব বস্তু হারাম করেছি, আহার্য গ্রহণকারীদের পক্ষে সেগুলো ছাড়া অন্য কোন কিছুই হারাম নয়।"

এ দু'টি আয়াতের মর্ম অনুযায়ী প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, খোদ কোরআনেরই অন্যান্য আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীসে অন্যান্য যে বস্তু হারাম হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, এ দু'আয়াতের দ্বারা কি সেসব বস্তু হারাম হওয়া রহিত করা হয়েছে?

উত্তর এই যে, প্রথম আয়াতে হালাল-হারামের সামগ্রিক নির্দেশ আসেনি কিংবা সম্পূরক আয়াতেও এমন কথা বলা হয়নি যে, পূর্ববর্তী আয়াতে যেসব বস্তুর নামোল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ছাড়া অন্যান্য কোন কিছুই হারাম নয়। বরং প্রথম আয়াতে জোর দিয়ে শুধুমাত্র এ-কথাই বলা হয়েছে যে, যে বস্তু-সামগ্রীর নাম এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, এগুলো সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, মুশরিকরা এমন কিছু বস্তুকে হালাল মনে করতো, যেগুলো আল্লাহ্র বিধানে হারাম। পক্ষান্তরে নিজেদের পূর্বসংস্কার এবং অভ্যাসের দরুন এমন কিছু বস্তুকে হারাম বলে গণ্য করতো, যেগুলো আল্লাহ্র বিধানে হালাল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কতকগুলো বস্তুর নাম উল্লেখ করে জোর দিয়ে দিচ্ছেন যে, এসব বস্তু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যাই থাক না কেন, এগুলো নিশ্চিতরূপেই হারাম। এ ছাড়া, হারাম বস্তু আল্লাহ্ তা'আলাই যেহেতু ওহীর মাধ্যমে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, সুতরাং তোমাদের ধারণা কিংবা সংস্কারের কারণে অন্য কোন কিছু হারাম হবে না।

আলোচ্য আয়াতে যে বস্তু-সামগ্রীকে হারাম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা চার। যেমন, মৃত পশু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যেসব জানোয়ার আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। উপরোক্ত চিহ্নিত চারটি বস্তুর সাথে স্বয়ং কোরআনেরই অন্য আয়াতে এবং হাদীস শরীফে আরো কতিপয় বস্তুর উল্লেখ এসেছে। সুতরাং সেসব নির্দেশ একত্র করে চিহ্নিত হারাম বস্তুগুলো সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

মৃত ঃ এর অর্থ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যবেহ করা জরুরী, সেসব প্রাণীই যদি যবেহ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যেমন আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে কিংবা দমবন্ধ হয়ে মারা যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশত খাওয়া হারাম হবে।

তবে কোরআন শরীফে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ----'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হলো।'

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তুর বেলায় যবেহ করার শর্ত আরোপিত হয়নি। ফলে এগুলো যবেহ ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদীসে মাছ এবং টিড্ডি নামক পত্যঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ দু'টির মৃতকেও হালাল করা হয়েছে। রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন---আমাদের জন্য দু'টি মৃত হালাল করা হয়েছে---মাছ এবং টিড্ডি। অনুরূপ দু' প্রকার রক্তও হালাল করা হয়েছে। যেমন যকৃৎ ও কলিজা।----(ইবনে-কাসীর, আহমদ, ইবনে-মাজাহ, দার-কুত্নী) সুতরাং বোঝা গেল যে, জীব-জন্তুর মধ্যে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গ মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, এ দু'টি যবেহ না করেও খাওয়া হালাল হবে। এগুলো ধরা পড়ে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কিংবা স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই মরুক না কেন, তাতে কিছু যায়-আসে না। তবে মাছ পানিতে মরে যদি পচে যায় এবং পানির উপরে ভেসে ওঠে, তবে তা খাওয়া যাবে না।---(জাস্সাস) অনুরূপ যেসব বন্য জীব-জন্তু ধরে যবেহ করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ্ বলে তীর কিংবা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে। তবে এমতাবস্থায়ও শুধু আঘাত দিয়ে মারলে চলবে না, কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত।

মাস'আলা ঃ বন্দুকের গুলীতে আহত কোন জন্তু যদি যবেহ করার আগেই মরে যায়, তবে সেগুলোও লাঠি বা পাথরের আঘাতে মরা জন্তুর পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে। কোরআনের অন্য এক আয়াতে যাকে مَوْقُوذَةٌ মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত) বলা হয়েছে; অর্থাৎ খাওয়া হালাল হবে না; মৃত্যুর আগেই যদি যবেহ করা হয়, তবে তা হালাল হবে।

মাস'আলা ঃ ইদানীং এক রকম চোখা গুলী ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের গুলী সম্পর্কে কোন কোন আলেম মনে করেন যে, এসব ধারালো গুলীর আঘাতে মৃত জন্তুর হুকুম তীরের আঘাতে মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত অনুযায়ী বন্দুকের গুলী চোখা এবং ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা, তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরপক্ষে বন্দুকের গুলী চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ হয়ে বারুদের বিস্ফোরণ ও দাহিকাশক্তির প্রভাবে জন্তুর মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং এরূপ গুলীর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত জানোয়ারও যবেহ করার আগে মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না।

মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতে "তোমাদের জন্য মৃত হারাম" বলাতে মৃত জানোয়ারের গোশ্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হিসাবে বিবেচিত হবে। যাবতীয় অপবিত্র বস্তু সম্পর্কেও সে একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ এগুলোর ব্যবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা কিংবা অন্য

কোন উপায়ে এগুলো থেকে যে কোনভাবে লাভবান হওয়াও হারাম। এমনকি মৃত জীব-জন্তুর গোশ্ত নিজ হাতে কোন গৃহপালিত জন্তুকে খাওয়ানোও জায়েয নয়। বরং সেগুলো এমন কোন স্থানে ফেলে দিতে হবে, যেন কুকুর-বিড়ালে খেয়ে ফেলে। নিজ হাতে উঠিয়ে কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ানোও জায়েয হবে না।--(জাস্‌সাস, কুরতুবী)

মাস'আলা ঃ 'মৃত' শব্দটি অন্য কোন বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করাতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই শামিল। কিন্তু অন্য এক আয়াতে عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। তাতে বোঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার যোগ্য। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যে সব অংশ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না সেগুলো ব্যবহার করা হারাম নয়, সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যবেহ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি।--(জাস্‌সাস)

চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য মৃত জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাকা না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম। কিন্তু পাকা করে নেওয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয। সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।---(জাস্‌সাস)

মাস'আলা ঃ মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তদ্দ্বারা তৈরী যাবতীয় সামগ্রীই হারাম। এসবের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম।

মাস'আলা ঃ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানীকৃত সাবান এবং অনুরূপ যেসব সামগ্রীতে জন্তুর চর্বি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ব্যবহার না করাই উত্তম। তবে সেগুলোতে মৃত জন্তুর চর্বি ব্যবহৃত হয় কিনা—এ সম্পর্কিত নিশ্চিত তথ্য অবগত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা হারাম হবে না। কেননা, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী, হযরত আবু মূসা আশআরী প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী মৃত জানোয়ারের চর্বি শুধু খাওয়া হারাম বলেছেন, তবে অন্য কাজে ব্যবহার করা জায়েয বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সে কারণে এ সবের ক্রয়-বিক্রয় তাঁরা হালাল বলেছেন। —(জাস্‌সাস)

মাস'আলা ঃ দুধের দ্বারা পনির তৈরী করার জন্য জন্তুর পেট থেকে সংগৃহীত এমন একটা উপাদান ব্যবহার করা হয়, আরবীতে যাকে 'নাফ্‌হা' বলা হয়। এটি দুধের সাথে মেশানোর সাথে সাথেই দুধ জমে যায়। সংশ্লিষ্ট জানোয়ারটি যদি হালাল এবং আল্লাহ্‌র নামে যবেহকৃত হয় তবে তার নাফ্‌হা ব্যবহার করায়ও কোন দোষ

নেই। কারণ, যবেহকৃত হালাল জন্তুর গোশত-চর্বি সবই হালাল। কিন্তু সে অংশটুকু যদি অযবেহকৃত অথবা কোন হারাম জন্তু থেকে নেওয়া হয়ে থাকে তবে তা দ্বারা প্রস্তুত পনির খাওয়া সম্পর্কে ফিকহশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মালেক (র.) সে পনির ব্যবহার করা যাবে বলে মত প্রকাশ করলেও ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং সুফিয়ান সওরী (র) প্রমুখ একে নাজায়েয বলেছেন। —(জাস্‌সাস, কুরতুবী)

ইউরোপ ও অন্যান্য অ-মুসলিম দেশে তৈরী যেসব পনির আসে, সেগুলোতে হারাম এবং যবেহ না করা জন্তুর চর্বি বা 'নাফহা' ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহর মতে এসব ব্যবহার না করাই উত্তম। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (র)-এর অভিমতের ভিত্তিতে তা ব্যবহারের অবকাশ রয়েছে। তবে যেসব পনিরে শূকরের চর্বি ব্যবহৃত হয় বলে যে কোন উপায়ে জানা যায়, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে হারাম ও না-পাক।

রক্ত ঃ আলোচ্য আয়াতে যেসব বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লিখিত হলেও সূরা আন'আমের এক আয়াতে أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا অর্থাৎ 'প্রবহমান রক্ত' উল্লিখিত হয়েছে। রক্তের সাথে 'প্রবহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই কলিজা-যকৃৎ প্রভৃতি জমাট বাঁধা রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফিকহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পাক ও হালাল।

মাস'আলা ঃ যেহেতু শুধুমাত্র প্রবহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, কাজেই যবেহ্ করা জন্তুর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে থেকে যায়, সেটুকুও হালাল ও পাক। ফিকহবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীসহ সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। একই কারণে মশা, মাছি ও ছারপোকার রক্ত নাপাক নয়। তবে যদি রক্ত বেশী হয় এবং ছড়িয়ে যায়, তবে তা ধুয়ে ফেলা উচিত।---(জাসসাস)

মাস'আলা ঃ রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তদ্বারা অর্জিত লাভালাভ হারাম। কেননা, কোরআনের আয়াতে 'রক্ত' শব্দটি অন্য কোন বিশেষণ ব্যতীতই ব্যবহৃত হওয়ার কারণে রক্ত বলতে যা বোঝায়, তার সম্পূর্ণটাই হারাম প্রতিপন্ন হয়ে গেছে, ফলে রক্তের দ্বারা উপকার গ্রহণ করার সবগুলো দিকই হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।

রুগীর গায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার মাস'আলা ঃ এই মাস'আলার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ রক্ত মানুষের শরীরের অংশ। শরীর থেকে বের করে নেওয়ার পর তা নাপাক। তদনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে একজনের রক্ত অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করানো দু'কারণে হারাম হওয়া উচিত—প্রথমত মানুষের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্মানিত এবং

আল্লাহ্ কর্তৃক সংরক্ষিত। শরীর থেকে পৃথক করে নিয়ে তা অন্যত্র সংযোজন করা সে সম্মান ও সংরক্ষণ বিধানের পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত এ কারণে যে, রক্ত 'নাজাসাতে-গলীযা' বা জঘন্য ধরনের নাপাকী, আর নাপাক বস্তুর ব্যবহার জায়েয নয়।

তবে নিরুপায় অবস্থায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমত, রক্ত যদিও মানুষের শরীরেরই অংশ, তথাপি এটা অন্য মানুষের শরীরে স্থানান্তরিত করার জন্য যার রক্ত, তার শরীরে কোন প্রকার কাটা-ছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না, কোন অঙ্গ কেটে পৃথক করতে হয় না। সুই-এর মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে রক্ত বের করে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তদনুসারে রক্তকে দুধের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা অঙ্গ কর্তন ব্যতিরেকেই একজনের শরীর থেকে বের হয়ে অন্যের শরীরের অংশে পরিণত হতে থাকে। শিশুর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলামী শরীয়ত মানুষের দুধকে মানবশক্তির খাদ্য হিসাবে নির্ধারিত করেছে এবং স্বীয় সন্তানকে দুধ-পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করে দিয়েছে। সন্তানদের পিতা কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হলে পর অবশ্য শিশুকে দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব থাকে না। কেননা, সন্তানদের খাদ্য-সংস্থানের দায়িত্ব পিতার ; মায়ের নয়। তাই পিতা তখন সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য অন্য স্ত্রীলোক নিয়োগ করবে অথবা অর্থের বিনিময়ে সন্তানের মাতাকেই দুধ পান করানোর জন্য নিয়োগ করবে।

কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে ঃ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۝

—"যদি তোমাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করায়, তবে তার বিনিময় পরিশোধ করে দেবে।"

মোটকথা, মায়ের দুধ মানবদেহের অংশ হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের খাতিরে শিশুদের জন্য তা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এমনকি ঔষধরূপে বড়দের জন্যও। যথা ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে ঃ

ولا بأس بان يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء عالمگيرى—

—অর্থাৎ ঔষধ হিসাবে স্ত্রীলোকের দুধ পুরুষের পক্ষে নাকে প্রবেশ করানো কিংবা পান করায় দোষ নেই।---(আলমগীরী)

ইবনে কুদামাহ্ রচিত 'মুগ্নী' গ্রন্থে এ মাস'আলা সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।---(মুগনী,--কিতাবুস্ সাইদ, ৮ম খণ্ড, ২০৬ পৃঃ)

রক্তকে যদি দুধের সাথে 'কেয়াস' তথা তুলনা করা হয়, তবে তা সামঞ্জস্যহীন হবে না। কেননা, দুধ রক্তেরই পরিবর্তিত রূপ এবং মানবদেহের অংশ হওয়ার ব্যাপারেও একই পর্যায়ভুক্ত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দুধ পাক এবং রক্ত নাপাক। সুতরাং হারাম হওয়ার প্রথম কারণ অর্থাৎ মানবদেহের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে তো নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা যুক্তিতে টেকে না। অবশিষ্ট থাকে দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ নাপাক হওয়া। এক্ষেত্রেও চিকিৎসার বেলায় অনেক ফিকহ্‌বিদ রক্ত ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় মানুষের রক্ত অন্যের দেহে স্থানান্তর করার প্রশ্নে শরীয়তের নির্দেশ দাঁড়ায় এই যে, সাধারণ অবস্থায় এটা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসার্থে, নিরুপায় অবস্থায় ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে জায়েয। 'নিরুপায় অবস্থায়' অর্থ হচ্ছে, রোগীর যদি জীবন-সংশয় দেখা দেয় এবং অন্য কোন ঔষধ যদি তার জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর বলে বিবেচিত না হয়, আর রক্ত দেওয়ার ফলে তার জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা যদি প্রবল থাকে, তবে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেওয়া কোরআন শরীফের সে আয়াতের মর্মানুযায়ীও জায়েয হবে, যে আয়াতে অনন্যোপায় অবস্থায় মৃত জন্তুর গোশ্‌ত খেয়ে জীবন বাঁচানোর সরাসরি অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আর যদি অনন্যোপায় না হয় এবং অন্য ঔষধ ব্যবহারে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়, তবে সে অবস্থায় রক্ত ব্যবহারের প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফিকহ্‌বিদ একে জায়েয বলেছেন এবং কেউ কেউ না-জায়েয বলেছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ্‌র কিতাবসমূহে 'হারাম বস্তুর দ্বারা চিকিৎসা' শীর্ষক আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

শূকর হারাম হওয়ার বিবরণ ঃ আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা হয়েছে, সেটি হল শূকরের মাংস। এখানে শূকরের সাথে 'লাহ্‌ম' বা মাংস শব্দ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এর দ্বারা শুধু মাংস হারাম—একথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং শূকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ হাড়, মাংস, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি সবকিছুই সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে 'লাহ্‌ম' শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায় নয়, তাই এটি যবেহ করলেও পাক হয় না। কেননা, গোশত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের যবেহ করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক হতে পারে, যদিও সেগুলো খাওয়া হারাম্। কিন্তু যবেহ করার পরও শূকরের মাংস হারাম তো বটেই, নাপাকও থেকে যায়। কেননা, এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 'নাজাসে-আইন' বা সম্পূর্ণ নাপাক। শুধুমাত্র চামড়া সেলাই করার কাজে শূকরের পশম দ্বারা তৈরী সূতা ব্যবহার করা জায়েয বলে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।---(জাস্‌সাস, কুরতুবী)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয় ঃ আয়াতে উল্লিখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে জীবজন্তু, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ অথবা উৎসর্গ করা হয়। সাধারণত এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে।

প্রথমত, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয় এবং যবেহ করার সময়ও সে নাম নিয়েই যবেহ করা হয়, যে নামে তা উৎসর্গিত। এ সুরতে যবেহকৃত জন্তু সমস্ত মত-পথের আলেম ও ফিকহ্বিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এটি মৃত এবং এর কোন অংশ দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ জায়েয হবে না। কেননা, وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ আয়াতে যে সুরতের কথা বোঝানো হয়েছে এ সুরতটি এর সরাসরি নমুনা, যে ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই।

দ্বিতীয় সুরত হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশে যা যবেহ করা হয়। তবে যবেহ করার সময় তা আল্লাহ্র নাম নিয়েই যবেহ করা হয়। যেমন, অনেক অজ্ঞ মুসলমান পীর-বুযুর্গগণের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মানত করে তা যবেহ করে থাকে। তবে যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়েই তা যবেহ করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহ্গণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং যবেহকৃত জন্তু মৃতের শামিল।

তবে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সুরতটি সম্পর্কে কিছুটা মত-পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির এবং ফিকহ্বিদ এ সুরতটিকেও আয়াতে উল্লিখিত 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যবেহকৃত' জীবের বিধানের অনুরূপ বিবেচনা করেছেন। যেমন, তফসীরে বায়যাবীর টীকায় বলা হয়েছে ঃ

فكل ما نودى عليه بغير اسم الله فهو حرام وان ذبح باسم الله تعالى حيث اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبيحة وقصد بذبحه التقرب الى غير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد ০

---অর্থাৎ "সে সমস্ত জন্তুই হারাম, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। যবেহ করার সময় তা' আল্লাহ্র নামেই যবেহ করা হোক না কেন। কেননা, আলেম ও ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন জন্তুকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানও যবেহ করে, তবে সে ব্যক্তি 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে এবং তার যবেহকৃত পশুটি মুরতাদের যবেহকৃত পশু বলে বিবেচিত হবে।"

দুররে-মুখতার কিতাবুয-যাবায়েহ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

لو ذبح لقدوم الامير ونحوه كواحد من العظماء يحرم لانه اهل به لغير الله ولو ذكر اسم الله - واقره الشامى ০

--যদি কোন আমীরের আগমন উপলক্ষে তাঁরই সম্মানার্থে কোন পশু যবেহ করা হয়, তবে যবেহকৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা, এটাও "আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয়"---এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত, যদিও যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়েই তা যবেহ করা হয়। শামীও এ অভিমত সমর্থন করেছেন।---(দুররে-মুখতার, ৫ম খণ্ড, ২১৪ পৃঃ)

কেউ কেউ অবশ্য উপরোক্ত সুরতটিকে وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ আয়াতের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন না। কেননা, আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি অনুসারে একেবারে সরাসরি তা বোঝায় না। তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত দ্বারা 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উদ্দেশে যা উৎসর্গ করা হয়, সে আয়াতের প্রতি যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ সুরতটিকেও হারাম করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তিই সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও সাবধানতাপ্রসূত।

উপরোক্ত সুরতটি হারাম হওয়ার সমর্থনে কোরআনের অন্য আর একটি আয়াতও দলীল হিসাবে পেশ করা যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ বাতেলপন্থীরা যেসব বস্তুর পূজা করে থাকে, সেই সবকিছুকে نصب বলা হয়। সেমতে আয়াতের অর্থ হয়ঃ সে সমস্ত পশু যেগুলোকে বাতেল উপাস্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ - উল্লিখিত রয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, وما اهل به আয়াতের সরাসরি প্রতিপাদ্য সে সমস্ত পশু, যেগুলো যবেহ করার সময় অন্য কোন কিছুর নামে যবেহ করা হয়। এরপরই ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ আয়াত এসেছে। এ আয়াতে যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নাম নেওয়ার কথা উল্লেখ নেই, শুধুমাত্র মূর্তি বা বাতিল উপাস্যের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যবেহ করার কথা এসেছে। এতে এখানে সে সমস্ত জন্তুও এ সুরতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে, যেগুলো যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবেহ করা হলেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে যবেহ করা হয়েছে।---(মাওলানা থানবীর ব্যাখ্যা)।

ইমাম কুরতুবীও তাঁর তফসীরে উপরোক্ত মতই সমর্থন করেছেন। তাঁর অভিমত হচ্ছেঃ

وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة وغلب ذالك فى استعمالهم حتى عبر به عن النية التى هى علة التحريم ০

অর্থাৎ আরবদের স্বভাব ছিল যে, যার উদ্দেশে যবেহ করা হতো, যবেহ করার সময় তার স্বরে সে নামই উচ্চারণ করতে থাকতো। ব্যাপকভাবে তাদের মধ্যে এ রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য প্রত্যাশা---যা সংশ্লিষ্ট পশু হারাম হওয়ার মূল কারণ, সেটাকে 'এহলাল' অর্থাৎ 'তারস্বরে নামোচ্চারণ' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী দু'জন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী (রা) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ফতওয়ার উপর ভিত্তি করেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

হযরত আলী (রা)-র শাসনামলে বিখ্যাত কবি ফরাযদাক-এর পিতা গালেব একটি উট যবেহ করেছিল। যবেহ্ করার সময় তাতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নাম উচ্চারণ করা হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এতদসত্ত্বেও হযরত আলী (রা) সে উটের গোশ্ত وما اهل به لغير الله আয়াতের মর্মানুযায়ী হারাম বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সাহাবীগণও হযরত আলী (রা)-র এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

অনুরূপ ইমাম মুসলিম তাঁর ওস্তাদ ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়ার সনদে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসের শেষভাগে রয়েছে যে, একজন স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে উম্মুল-মোমেনীন! আজমী লোকদের মধ্যে আমাদের কিছু সংখ্যক দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে! তাদের মধ্যে সব সময় কোন-না-কোন উৎসব লেগেই থাকে। উৎসবের দিনে কিছু হাদিয়া-তোহ্ফা তারা আমাদের কাছেও পাঠিয়ে থাকে। আমরা তাদের পাঠানো সেসব সামগ্রী খাবো কি না? জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বলেছিলেন ঃ

واما ما ذبح لذالك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من اشجارهم ০

অর্থাৎ সে উৎসব দিবসের জন্য যেসব পশু যবেহ করা হয়, সেগুলো খেয়ো না, তবে তাদের ফলমূল খেতে পার।---(তফসীরে-কুরতুবী, ২য় খণ্ড, ২০৭ পৃঃ)

মোটকথা, দ্বিতীয় সূরতটি, যাতে নিয়ত থাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভ, কিন্তু যবেহ করা হয় আল্লাহ্র নামেই, সেটিও হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য অর্জন, এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার দরুন وما اهل به لغير الله আয়াতের হুকুম। দ্বিতীয় আয়াত وما ذبح على النصب এরও প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত হওয়ায় এ শ্রেণীর পশুর মাংসও হারাম হবে।

তৃতীয় সূরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোন চিহ্ন অঙ্কিত করে কোন দেব-দেবী বা পীর-ফকীরের নামে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোন কাজ নেওয়া হয় না, যবেহ করাও উদ্দেশ্য থাকে না। বরং যবেহ করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণীর পশু আলোচ্য দু'আয়াতের কোনটিরই আওতায় পড়ে না, এ শ্রেণীর পশুকে কোরআনের ভাষায় 'বাহীরা' বা সায়েবা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ কারো নামে কোন পশু প্রভৃতি জীবন্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া কোরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম, যেমন বলা হয়েছে ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বাহীরা বা সায়েবা সম্পর্কে কোন বিধান দেন নি। তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না। বরং হারাম মনে করাতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয়। তাই এরূপ উৎসর্গিত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতই হালাল।

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, তারই মালিকানাতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরীয়তের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসর্গীকরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর উপর তার পরিপূর্ণ মালিকানা কায়েম থাকে। সেমতে উৎসর্গকারী যদি সেই পশু কারো নিকট বিক্রয় করে কিংবা অন্য কাউকে দান করে দেয়, তবে ক্রেতা ও দান-গ্রহীতার জন্য সেটি হালাল হবে। পৌত্তলিক সমাজের অনেকেই মন্দির বা দেব-দেবীর নামে পশু-পাখী উৎসর্গ করে সেগুলো পূজারী বা সেবায়েতদের হাতে তুলে দেয়। সেবায়েতরা সেসব পশু বিক্রয় করে থাকে। এরূপ পশু ক্রয় করা সম্পূর্ণ হালাল।

এক শ্রেণীর কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমানকেও পীর-বুযুর্গের মাযারে ছাগল-মুরগী ইত্যাদি ছেড়ে আসতে দেখা যায়। মাযারের খাদেমরাই সাধারণত উৎসর্গিত সেসব জন্তু ভোগ-দখল করে থাকে। যেহেতু মূল মালিক খাদেমগণের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় এবং এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের পূর্ণ ইখতিয়ার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণীর জীবজন্তু ক্রয় করা, যবেহ করে খাওয়া, বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হালাল।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে মানত সম্পর্কিত মাস'আলা ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কোন কিছুর নামে জীব-জানোয়ার উৎসর্গ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো একটি মাস'আলা হচ্ছে পৌত্তলিকদের দেব-দেবী এবং কোন কোন অজ্ঞ মুসলমান কর্তৃক পীর-বুযুর্গদের মাযার-দরগায় যেসব মিষ্টান্ন বা খাদ্যবস্তু মানত করা হয় বা সেসবের নামে উৎসর্গ করা হয়, সেগুলোতেও মূল কারণ---'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন-কিছুর সন্তুষ্টি বা সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্য থাকে বলেই অধিকাংশ ফিকহ্‌বিদ হারাম বলেছেন। আর এগুলো খাওয়া-পরা, অন্যকে খাওয়ানো এবং বেচাকেনা করাকেও হারাম বলা হয়েছে। বাহ্‌রুর-রায়েক প্রভৃতি ফিকহ্‌র কিতাবে এ ব্যাপারে সবিস্তার বিবরণ রয়েছে। এই মাস'আলাটি উৎসর্গিত পশু-সংক্রান্ত মাস'আলার উপর কেয়াস করে গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্ষুধার আতিশয্যে নিরুপায় অবস্থার বিধি-বিধান ঃ উল্লিখিত আয়াতে চারটি বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর এর ব্যতিক্রমী বিধানও বর্ণনা করা হয়েছে। যথা---

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

এই হুকুমে এতটুকু অবকাশ রাখা হয়েছে যে, ক্ষুধার আতিশয্যে যে ব্যক্তি নিতান্তই অনন্যোপায় হয়ে পড়বে, সে যদি উল্লিখিত হারাম বস্তু থেকে কিছুটা খেয়েও নেয়, তবে তার কোন পাপ হবে না। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল এই যে, সে (১) স্বাদ-গ্রহণের প্রতি আগ্রহী হবে না এবং (২) প্রয়োজনের পরিমাণ অতিক্রম করবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, মহা দয়ালু।

এখানে ক্ষুধার তাড়নায় মরণোন্মুখ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার জন্য দু'টি শর্তে উল্লিখিত হারাম বস্তু নিতান্ত প্রয়োজন পরিমাণে খাওয়ার পাপকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় ক্ষুধার আতিশয্যে ব্যাকুল সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। সাধারণ কষ্ট কিংবা প্রয়োজনকে ব্যাকুলতা বলা হয় না। কাজেই যে লোক ক্ষুধার এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, তখন কোন কিছু না খেতে পারলে জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে, তখন সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে দু'টি শর্তে —এসব হারাম বস্তু খেয়ে নেওয়ার অবকাশ রয়েছে। একটি শর্ত হল যে, উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র জান বাঁচানো বা প্রাণ রক্ষা করা, খাবার স্বাদ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হবে না। দ্বিতীয়ত, সে খাবারের পরিমাণ এতটুকুতে সীমিত রাখবে, যাতে শুধু প্রাণটুকুই রক্ষা পেতে পারে, পেট ভরে খাওয়া কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া তখনও হারাম হবে।

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ এ ক্ষেত্রে কোরআন করীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি, বলেছে لا جناح عليه (তাতে তার কোন পাপ নেই)। এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনও যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার অনন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কোন বস্তুর হালাল হওয়া আর গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়া এক কথা নয়, এ দু'য়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় অন-ন্যোপায় লোকদের জন্য যদি এসব বস্তু হালাল করে দেওয়া উদ্দেশ্য হত, তাহলে হারাম বা অবৈধতাকে রহিত করে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখানে 'তার কোন পাপ নেই' কথাটি যোগ করে দেওয়া হয়েছে। এতে এই তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হারাম হওয়ার বিষয়টি যথাস্থানে বহাল রয়েছে এবং সেটি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার যে পাপ তাও পূর্বের মতোই বলবৎ রয়েছে। তবে অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য হারাম বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে মাত্র।

অনন্যোপায় অবস্থায় ঔষধ হিসাবে হারাম বস্তুর ব্যবহারঃ উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, কারো জীবন বিপন্ন হয়ে পড়লে সে ঔষধ হিসাবে হারাম বস্তু ব্যবহার করতে পারে। তবে আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ীই এ ব্যাপারেও কিছু শর্ত রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমত, প্রকৃতই অনন্যোপায় এবং জীবন-সংশয়ের মত অবস্থা হতে হবে। সাধারণ কষ্ট বা রোগব্যাধির ক্ষেত্রে এ নির্দেশ কার্যকর হবে না। দ্বিতীয়ত, হারাম বস্তু ছাড়া অন্য কোন কিছুই যদি এ রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে

কার্যকর না হয় কিংবা যদি পাওয়া না যায়। কঠিন ক্ষুধার সময়ও অবকাশ এমন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যখন প্রাণ রক্ষা করার মত আর অন্য কোন হালাল খাবার না থাকে কিংবা সংগ্রহ করার কোন ক্ষমতা না থাকে। তৃতীয়ত, সে হারাম বস্তু গ্রহণে যদি প্রাণ রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়। ক্ষুধার তাড়নায় অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য যেমন এক লোকমা হারাম মাংস খেয়ে নেওয়া সাধারণত তার প্রাণ রক্ষার নিশ্চিত উপায়। যদিও কোন ঔষধ এমন হয় যে, তার ব্যবহার উপকারী বলে মনে হয় বটে, কিন্তু তাতে তার সুস্থতা নিশ্চিত নয়, তাহলে এমতাবস্থায় সে হারাম ঔষধের ব্যবহার উল্লিখিত আয়াতের ব্যতিক্রমী হুকুমের আওতায় জায়েয হবে না। এরই সঙ্গে আরও দু'টি শর্ত কোরআনের আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে যে, তার ব্যবহারে কোন উপভোগ যেন উদ্দেশ্য না হয় এবং যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা না হয়।

উল্লিখিত আয়াতের পরিষ্কার বর্ণনা ও ইঙ্গিতসমূহের দ্বারা যেসব শর্ত ও বাধ্য-বাধকতার বিষয় জানা যায়, সে সমস্ত শর্তসাপেক্ষে যাবতীয় হারাম ও নাপাক ঔষধের ব্যবহার তা খাবারই হোক কিংবা বাহ্যিক ব্যবহারেরই হোক সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ফিকহ্‌বিদগণের ঐকমত্যে জায়েয। এ সমস্ত শর্তের সারমর্ম হল পাঁচটি বিষয়ঃ

(১) অবস্থা হবে অনন্যোপায়। অর্থাৎ প্রাণনাশের আশংকা সৃষ্টি হলে, (২) অন্য কোন হালাল ঔষধ যদি কার্যকর না হয় কিংবা পাওয়া না যায়, (৩) এই ঔষধের ব্যবহারে আরোগ্য লাভ যদি নিশ্চিত হয়, (৪) এর ব্যবহারে যদি কোন আনন্দ উদ্দেশ্য না হয়, এবং (৫) প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা না হয়।

অনন্যোপায় অবস্থা ব্যতীত সাধারণ চিকিৎসা ও ঔষধে হারাম বস্তুর ব্যবহার ঃ অনন্যোপায় অবস্থা-সংক্রান্ত মাস'আলাটি তো উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে কোরআনের স্পষ্ট আয়াত ও ওলামাগণের ঐকমত্যে প্রমাণিত হয়ে গেল, কিন্তু সাধারণ রোগ-ব্যাধিতেও না-পাক ও হারাম ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয কি না, এ মাস'আলার ব্যাপারে ফকীহ্‌-গণের মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে অনন্যোপায় অবস্থা এবং উল্লিখিত শর্তাশর্তের অবর্তমানে কোন হারাম বস্তু ঔষধরূপে ব্যবহার জায়েয নয়। কারণ, হাদীসে রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্‌ ঈমানদারদের জন্য কোন হারামের মধ্যে আরোগ্য রাখেন নি।"---(বোখারী)

অপরাপর কোন কোন ফকীহ্‌ হাদীসে উদ্ধৃত এক বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে একে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি হল ওরায়নাবাসিগণের, যা সমস্ত হাদীস গ্রন্থেই উদ্ধৃত রয়েছে। তা হল এই যে, এক সময় কিছু সংখ্যক গ্রাম্য লোক মহানবী (সা)-র দরবারে উপস্থিত হয়। তারা ছিল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। মহানবী (সা) তাদেরকে উষ্ট্রীর দুধ ও মূত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন, যাতে তারা আরোগ্য লাভ করেছিল।

কিন্তু এ ঘটনায় এমন কতিপয় সম্ভাব্যতা বিদ্যমান, যাতে হারাম বস্তুর ব্যবহারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। কাজেই সাধারণ রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে অনন্যোপায় অবস্থা এবং শর্তসমূহের উপস্থিতি ছাড়া হারাম ঔষধ ব্যবহার না করাই হচ্ছে আসল হুকুম।

কিন্তু পরবর্তী যুগের ফকীহ্‌গণ বর্তমান যুগে হারাম ও নাপাক ঔষধ-পত্রের আধিক্য এবং সাধারণ অভ্যাস ও জনগণের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্য কোন হালাল ও পবিত্র ঔষধ এ রোগের জন্য কার্যকর নয় কিংবা পাওয়া না যাওয়ার শর্তে তা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

كما فى الدر المختار قبيل فصل البير اختلف فى التداوى بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما فى رضاع البحر ولكن نقل المصنف ثم وههنا عن الحاوى قيل يرخص اذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء اخر كما رخص فى الخمر للعطشان وعليه الفتوى - ومثله فى العالمگيرية -

অর্থাৎ দুর্‌রে-মুখতার গ্রন্থের 'বি'র' বা কূপ-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের পূর্বে উল্লেখ রয়েছে যে, হারাম বস্তু-সামগ্রী ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করার প্রশ্নে মতবিরোধ রয়েছে। সাধারণভাবে শরীয়ত অনুযায়ী উহা নিষিদ্ধ। যেমন, 'বাহ্‌রোর-রায়েক' গ্রন্থের স্তন্যদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদেও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু 'তানবীর' রচয়িতা এক্ষেত্রে স্তন্যদান সম্পর্কেও 'হাবী কুদ্‌সী' থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, কোন কোন ওলামা ঔষধ ও চিকিৎসার জন্য হারাম বস্তু-সামগ্রীর ব্যবহারকে এই শর্তে জায়েয বলেছেন যে, সে ঔষধের ব্যবহারে আরোগ্য লাভ সাধারণ ধারণায় নিশ্চিত হতে হবে এবং কোন হালাল ঔষধও তার বিকল্প হিসাব যদি না থাকে। যেমন, একান্ত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্য মদের এক ঘোট পান করে জীবন রক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একই অভিমত আলমগিরীতেও ব্যক্ত করা হয়েছে।

মাস'আলা ঃ উল্লিখিত বিশ্লেষণে সে সমস্ত বিলেতী ঔষধ-পত্রের হুকুমও জানা গেল, যা ইউরোপ প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানী হয়ে আসে এবং যাতে শরাব, এ্যালকোহল কিংবা অপবিত্র বস্তুর উপস্থিতি জানাও নিশ্চিত। বস্তুত যেসব ঔষধে হারাম ও নাপাক বস্তুর উপস্থিতি সন্দিগ্ধ, তার ব্যবহারে আরও অধিকতর অবকাশ রয়েছে। অবশ্য সতর্কতা উত্তম। বিশেষত যখন কোন কঠিন প্রয়োজন থাকে না তখন সতর্কতা অবলম্বন করাই কর্তব্য।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَ
الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ
اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ
لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿١٧٦﴾ ع

(১৭৪) নিশ্চয় যারা গোপন করে, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন কিতাবে এবং সেজন্য গ্রহণ করে অল্প মূল্য, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৭৫) এরাই হল সে সমস্ত লোক, যারা খরিদ করেছে হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব। অতএব, তারা দোযখের উপর কেমন ধৈর্য ধারণকারী! (১৭৬) আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ নাযিল করেছেন সত্যসহ কিতাব। আর যারা কিতাবের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে, নিশ্চিতই তারা জেদের বশবর্তী হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব হারাম বস্তু-সামগ্রীর আলোচনা করা হয়েছিল, যেগুলো ছিল স্থূল বস্তু সম্পর্কিত যা ধরা-ছোঁয়া বা অনুভব করা যায়। পরবর্তীতে এমন কতকগুলো হারাম বিষয়ের আলোচনা করা হচ্ছে, যেগুলো ধরা-ছোঁয়ার মত স্থূল বস্তু নয়। সেগুলো হচ্ছে কতকগুলো গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কিত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মন্দ কাজ। যেমন, ইহুদী আলেমদের মাঝে একটি রোগ ছিল যে, তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তাদের মনমত ভুল ফতোয়া দিয়ে দিত, এমনকি তাওরাতের আয়াতসমূহকেও বিকৃত করে তাদের মতলবমত বানিয়ে দিত। এক্ষেত্রে উম্মতে-মুহাম্মদীর আলেমদের জন্যও সতর্কতা বিদ্যমান, তারা যেন এহেন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকেন। রিপুর কামনা-বাসনা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে যেন সত্য বিধি-বিধান প্রকাশে ত্রুটি না করেন।

ধর্মকে বিক্রি করার শাস্তি ঃ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত কিতাবের বিষয়বস্তুকে যেসব লোক গোপন করে এবং এহেন খেয়ানতের বিনিময়ে সামান্য (পার্থিব) সম্পদ আদায় করে, তারা নিজেদের উদরকে আগুনের দ্বারাই ভর্তি করে চলছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন না তাদের সাথে

(সদয়ভাবে) কথা বলবেন, আর নাইবা (তাদের পাপ মোচন করে) তাদেরকে পবিত্রতা দান করবেন। বস্তুত তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এরা এমন সব লোক, যারা (দুনিয়াতে তো) হেদায়েত পরিহার করে পথভ্রষ্টতা অলবন্ধন করছেই, (তদুপরি আখেরাতের) মাগফেরাত পরিত্যাগ করে (নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে) আযাব। অতএব, (তাদের দোযখে গমনের সৎসাহসকে ধন্যবাদ) কতই না সাহসী এরা! বস্তুত (উল্লিখিত সমস্ত) আযাব (তাদের উপর এজন্য এসেছে) যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ কিতাবকে সঠিকভাবেই পাঠিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে যেসব লোক (এমন যথার্থভাবে প্রেরিত গ্রন্থে) পথভ্রষ্টতা (আরোপ) করে, (তারা যে,) অতি সুদূরপ্রসারী বিরোধিতায় লিপ্ত (হবে, তা বলাই বাহুল্য। আর এমন বিরোধিতার দরুন অবশ্যই তারা কঠিন শাস্তির যোগ্য হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে শরীয়তের হুকুম-আহকামকে পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে হারাম ধন-সম্পদ খায়, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরছে। কারণ, এ কাজের পরিণতি তাই। কোন কোন বিজ্ঞ আলেমের মতে প্রকৃতপক্ষে হারাম মাল বা ধন-সম্পদ সবই দোযখের আগুন। অবশ্য তা যে আগুন, সেকথা পার্থিব জীবনে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু মৃত্যুর পর তার সে কর্মই আগুনের রূপ ধরে উপস্থিত হবে।

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَ
الْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۙ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

(১৭৭) সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর, কেয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলের উপর, আর ব্যয় করবে সম্পদ তাঁরই মুহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিস্‌কীন মুসাফির এবং ভিক্ষুকদের জন্য এবং মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং বিপদাপদে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী, তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।

বয়ানুল কোরআন থেকে উদ্ধৃত যোগসূত্র ঃ শুরু থেকে এ পর্যন্ত সূরা বাক্বারার প্রায় অর্ধেক। এ পর্যন্ত আলোচনার বেশীর ভাগেরই লক্ষ্য ছিল 'মুনকের' সম্প্রদায়। কারণ, সর্বাগ্রে কোরআন-করীমের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে তার মান্যকারী ও অমান্যকারী সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর 'তওহীদ' বা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ প্রমাণ করা হয়েছে। তারপর وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ আয়াত পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানদের প্রতি যে অনুগ্রহ ও নেয়ামতসমূহ দেওয়া হয়েছে তা বিবৃত করা হয়েছে। সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে কেবলা সংক্রান্ত আলোচনা। আর তার সমাপ্তি টানা হয়েছে 'সাফা' ও 'মারওয়ার' আলোচনার মাধ্যমে।

অতঃপর তওহীদ প্রমাণ করার পর শিরকের মূল ও শাখা-প্রশাখাগুলোর খণ্ডন করা হয়। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত বিষয় মুনকেরীনদের প্রতিই তাম্বীহ ছিল অধিক। আর প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন ব্যাপারে মুসলমানদেরও সম্বোধন করা হয়েছে।

এখন সূরা বাক্বারার প্রায় মধ্যবর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানগণকে মৌলিক সৎকর্মসমূহ ও আনুষঙ্গিক নীতিমালার শিক্ষা দানই মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে অমুসলিমদের প্রতিও সম্বোধন থাকতে পারে। আর এ বিষয়টি সূরার শেষ পর্যন্তই ব্যাপ্ত। বিষয়টি আরম্ভ করা হয়েছে بِر (বির্‌রুন্) সংক্ষিপ্ত শিরোনামে। তা'হল 'বা' বর্ণের মধ্যে 'যের' স্বরচিহ্নক্রমে بِرّ (বির্‌রুন্) শব্দের সাধারণ অর্থ হয় মঙ্গল, যা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদত ও সৎকাজেই ব্যাপক। বস্তুত এভাবে প্রাথমিক আয়াতগুলোতে একটি শব্দের মাধ্যমে সামগ্রিক ও নীতিগত বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন, কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, ধন-সম্পদ দান করা, ওয়াদা পালন, বিপদে ধৈর্যধারণ প্রভৃতি। এতে সমগ্র কোরআনী বিধি-বিধানের মৌলিক নীতিগুলো এসে গেছে। কারণ, শরীয়তের সমগ্র আহ্‌কাম বা বিধি-বিধানের সারনির্যাস হল তিনটি ঃ (১) আকায়েদ বা বিশ্বাস, (২) আ'মাল বা আচার-আচরণ ও কাজকর্ম, (৩) চরিত্র। আর বাকী যা কিছু, সবই হলো এগুলোর শাখা-প্রশাখা এবং এই তিনটির অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের বিশেষ বিশেষ দিকগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

পরবর্তীতে بر -এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাতে প্রসঙ্গক্রমে স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদানুযায়ী শরীয়তের বহু বিধি-বিধান যথা, কিসাস, ওসীয়ত, রোযা নামায, জেহাদ, হজ্জ, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, ঋতুস্রাব, ঈলা, কসম খাওয়া, তালাক, বিয়ে-শাদী, ইদ্দত, মোহরানা, জেহাদের পুনরালোচনা, আল্লাহ্‌র কাজে ব্যয় করা, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন কোন বিষয় এবং সাক্ষ্যদান প্রভৃতি বিষয় প্রয়োজনানুযায়ী আলোচনা করে ওয়াদা, সুসংবাদ, রহমত ও ক্ষমা সংক্রান্ত আলোচনায় সমাপ্তি টানা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ্! কি চমৎকার সুবিন্যস্ত ধারাবাহিকতা! যা হোক, যেহেতু এ সমস্ত বিষয়ের মুখ্যই হল بر বা কল্যাণ, কাজেই সামগ্রিকভাবে এ আলোচ্য বিষয়টিকে ابواب البر বা কল্যাণ-পরিচ্ছেদ নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কল্যাণ পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ব অথবা পশ্চিমদিকে মুখ করে দাঁড়ানোতেই সকল পুণ্য সীমিত নয়। আসল পুণ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি (সত্তা ও সকল গুণাবলীসহ) ঈমান (দৃঢ় আস্থা) পোষণ করা এবং (একইভাবে) কেয়ামতের (আগমন) সম্পর্কে এবং ফেরেশতাগণের প্রতি (যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা, নূরের সৃষ্টি, নিষ্পাপ মাসূম, খাদ্য-পানীয় এবং মানবীয় কাম প্রবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত) এবং (সমগ্র আসমানী) কিতাবের প্রতি এবং (সমগ্র) পয়গম্বরগণের প্রতিও। এবং (পুণ্যবান সেই ব্যক্তি যে মাল-সম্পদ দেয় আল্লাহ্‌র মহব্বতে (অভাবী) আত্মীয়-স্বজন এবং (অসহায়) ইয়াতীমদেরকে (অর্থাৎ যেসব শিশুকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক রেখে পিতার মৃত্যু হয়েছে) এবং (অন্যান্য দরিদ্র) মুখাপেক্ষীগণকেও এবং (পাথেয়হীন) মুসাফিরকে আর (অনন্যোপায়) সাহায্য-প্রার্থীদেরকে এবং (কয়েদী ও ক্রিতদাসদের) মুক্ত করার জন্য। এবং (সে ব্যক্তি) নিয়মিত নামায পড়ে এবং (নির্ধারিত পরিমাণ) যাকাতও প্রদান করে। এবং যেসব লোক (উপরোক্ত আমল ও আখলাকের সাথে সাথে) স্ব স্ব অঙ্গীকারও পূরণ করে থাকে, যখন কোন (বৈধ ব্যাপারে) অঙ্গীকার করে। আর (এসব গুণের পর বিশেষ ভাবে) যেসব লোক ধীরচিত্ত হয় অভাবে পতিত হলে, (দ্বিতীয়ত) রোগাক্রান্ত হলে (তৃতীয়ত) (কাফিরদের মোকাবেলায়) তুমুল যুদ্ধেও (অর্থাৎ, এমতাবস্থাতেও যারা অস্থিরচিত্ত কিংবা হিম্মতহারা হয় না) সেসব লোকই (পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত) সত্যপন্থী এবং এসব লোকই (প্রকৃত) মোত্তাকী (নামে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য)। মোটকথা দ্বীনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং পরিপূর্ণতা হচ্ছে উপরোক্ত আমলসমূহ। নামাযের মধ্যে বিশেষ একদিকে মুখ করে দাঁড়ানোও সে সমস্ত মহত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে বিশেষ একটি। কেননা, কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো নামায কায়েম করার শর্তাবলীর অন্তর্গত। সুতরাং সুষ্ঠুভাবে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানোর দ্বারা নামাযে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। অন্যথায়, যদি নামাযই না হতো তবে কোন বিশেষ দিকের প্রতি রুখ করে দাঁড়ানো ইবাদত বলেই গণ্য হতো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানদের কেবলা যখন বায়তুল মোকাদ্দাসের দিক থেকে পরিবর্তিত করে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে নির্ধারণ করা হলো, তখন ইহুদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি যারা সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে ত্রুটি তালাশ করার ফিকিরে থাকতো, তারা তৎপর হয়ে উঠলো এবং নানাভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইসলামের প্রতি অবিরামভাবে নানা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করল। এসব প্রশ্নের জবাব পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য একটি আয়াতে একটা বিশেষ বর্ণনাভঙ্গীর মাধ্যমে এ বিতর্কের মধ্যে যতি টেনে দেওয়া হয়েছে, যার সারমর্ম হচ্ছে, নামাযে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে কি পশ্চিম দিকে—এ বিষয়টা নির্ধারণ করাই যেন তোমরা দ্বীনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের সকল আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে। মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরীয়তের অন্য কোন হুকুম-আহকামই যেন আর নেই।

অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলমান, ইহুদী, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, প্রকৃত পুণ্য বা নেকী আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যে নিহিত। যে দিকে রুখ করে তিনি নামাযে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায়, দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনই বৈশিষ্ট্য নাই। দিক বিশেষের সাথে কোন পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। পুণ্য একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য করার সাথে সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যতদিন বায়তুল-মোকাদ্দাসের প্রতি রুখ করে নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে রুখ করাতেই পুণ্য ছিল। আবার যখন মসজিদুল-হারামের দিকে রুখ করে দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে, তখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে।

আয়াতের যোগসূত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি থেকে সূরা-বাক্বারার একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তালীম ও হেদায়েত প্রদানই মুখ্য লক্ষ্য। প্রসঙ্গত বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দেওয়া হয়েছে। সেমতে আলোচ্য এ আয়াতটিকে ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবহ আয়াত বলে অভিহিত করা যায়।

অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচ্য এ আয়াতে ই'তিকাদ বা বিশ্বাস, ইবাদত, মোয়ামালাত বা লেনদেন এবং আখলাক সম্পর্কিত বিধি-বিধানের মূলনীতিসমূহের আলোচনা মোটামুটিভাবে এসে গেছে। প্রথম বিষয় ঃ ইতিকাদ বা মৌল বিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শীর্ষক আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইবাদত এবং মোয়ামালাত সম্পর্কিত। তার মধ্যে ইবাদত সম্পর্কিত আলোচনা وَاٰتَى الزَّكٰوةَ পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর মোয়ামালাতের আলোচনা وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ শীর্ষক আয়াতে করা হয়েছে। এরপর আখলাক-সম্পর্কিত আলোচনা وَالصّٰبِرِيْنَ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সবশেষে বলা হয়েছে যে, সত্যিকার মু'মিন ঐ সমস্ত লোক, যারা সে সমস্ত নির্দেশাবলীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে এবং এ সমস্ত লোককেই প্রকৃত মোত্তাকী বলা যেতে পারে।

এ সমস্ত নির্দেশাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক উন্নত বর্ণনাভঙ্গী এবং সালঙ্কার ইশারা-ইঙ্গিত ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, সম্পদ ব্যয়-সম্পর্কিত নির্দেশটির সঙ্গে عَلٰى حُبِّهٖ অর্থাৎ তাঁর মহব্বতে কথাটি শর্ত হিসাবে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এতে তিন ধরনের অর্থ হওয়া সম্ভব। প্রথমত حُبِّهٖ শব্দের শেষে সংযুক্ত هٖ সর্বনামটি যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ধরা যায়, তবে অর্থ দাঁড়াবে, তার সেই সম্পদ ব্যয় করার পেছনে কোন আত্মস্বার্থ, নাম-যশ অর্জন প্রভৃতির উদ্দেশ্যের লেশমাত্রও থাকে না। বরং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতই হয় এ ব্যয়ের পিছনে মূল প্রেরণা।

দ্বিতীয়ত, সর্বনামটি যদি ধন-সম্পদের প্রতি সম্পর্কযুক্ত ধরা হয়, তবে অর্থ হবে---আল্লাহ্‌র রাস্তায় ঐ সম্পদ ব্যয় করাই পুণ্যের কাজ, যে ধন-সম্পদ তার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। ফেলে দেওয়ার মত বেকার বস্তু কাউকে দিয়ে সে দানকে সদকা মনে করা প্রকৃত প্রস্তাবে 'সদকা' নয়, যদিও ফেলে দেওয়ার চাইতে অন্যের কাজে লাগতে পারে—এ ধারণায় কাউকে দিয়ে দেওয়াই উত্তম।

তৃতীয়ত, যদি সর্বনামকে اٰتَى শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত ধরা হয়, তবে অর্থ হবে, সম্পদ ব্যয় করার সময় মানসিক সন্তুষ্টি ও আন্তরিকতার সাথে তা ব্যয় করে; ব্যয় করার সময় অন্তরে কষ্ট অনুভূত হয় না।

ইমাম জাস্‌সাস বলেন, আয়াতের উপরোক্ত তিনটি অর্থই নেওয়া যেতে পারে। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে প্রথম ধন-সম্পদ ব্যয় করার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ খাত বর্ণনা করে পরে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এ দু'টি খাত যাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমেই এ দু'টি খাতের কথা বর্ণনা করার পরে যাকাতের কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, সাধারণত মানুষ আলোচ্য দু'টি খাতে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করে, কিন্তু তা উচিত নয়। শুধুমাত্র যাকাত প্রদান করেই সম্পদের যাবতীয় হক পূরণ হয়ে গেল বলে ধারণা করে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীর দ্বারাই এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরয শুধুমাত্র যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, যাকাত ছাড়া আরও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে।---(জাস্‌সাস, কুরতুবী)

যেমন, রুযী-রোযগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে যাকাত প্রদান করার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরয হয়ে পড়ে।

অনুরূপ, যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরি করা এবং দ্বীনী-শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরযের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোন অবস্থায় যাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের বেলায় প্রয়োজন দেখা দেওয়া শর্ত। যেখানে প্রয়োজন রয়েছে সেখানে খরচ করা ফরয, যদি প্রয়োজন দেখা না দেয়, তবে খরচ করাও ফরয হবে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ নিকটাত্মীয়, মিসকীন, মুসাফির, দরিদ্র প্রার্থী প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, তাদের কথা একসাথে বর্ণনা করার পর--- وَفِى الرِّقَابِ-এর মধ্যে---فِى শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অন্যের মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাসদেরকে সম্পদের মালিক বানানো উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করাই এখানে লক্ষ্য।

এরপর وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ অর্থাৎ, নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করার কথা পূর্ববর্তী অন্যান্য বিধান সম্পর্কিত বর্ণনার মতই বলা হয়েছে।

অতঃপর পূর্ববর্তী বর্ণনাভঙ্গী পরিবর্তন করে অতীতকাল বাচক শব্দের স্থলে وَالْمُوفُونَ بِالْعَهْدِ বাক্যটি ইসমে-ফায়েল (কারক পদ) ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মু'মিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না। কেননা, এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফির-গোনাহ্‌গাররাও ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না।

তেমনিভাবে মোয়ামালাতের বর্ণনায় শুধুমাত্র অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব, ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকের সুষ্ঠুতা ও পবিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল।

এরপরই আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র 'সবর'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, সবর-এর অর্থ হচ্ছে

মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়-বৃত্তিসহ অভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবরই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

বর্ণনাভঙ্গীর আরো একটি পরিবর্তন এখানে লক্ষণীয়। পূর্ববর্তী বাক্যে وَالْمُوفُونَ বলার পর এখানে وَالصَّابِرُونَ না বলে وَالصَّابِرِينَ বলা হয়েছে। মুফাস্‌সিরগণ বলেন, এখানে مدح বা প্রশংসা কথাটা উহ্য রাখার ফলেই এ'রাবে এ পরিবর্তন এসেছে। তাঁদের পরিভাষায় একে বলা হয় نصب على المدح এখানে صَابِرِينَ কথাটা মফউল বা কর্ম হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায় যে, যাঁরা উপরোক্ত সৎকর্ম সম্পাদন করেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রশংসার যোগ্য হলেন সবরকারীগণ। কেননা, সবরই এমন এক শক্তি ও যোগ্যতা, যদ্দ্বারা উপরোক্ত সব সৎ কাজেই সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াত ক'টিতে যেমন দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ সব বিধানের মূলনীতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, তেমনিভাবে অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও স্তরবিন্যাস করে দেওয়া হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ
عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

(১৭৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে 'কিসাস' গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের

বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৭৯) হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে উত্তম চরিত্র ও সৎকর্মাবলীর মূলনীতি আলোচনা করা হয়েছে। এরপর সেসমস্ত সৎকার্যাবলীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে একেকটি বিষয়ের স্বতন্ত্র বর্ণনাও দেওয়া হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি কিসাস' (আইন)-এর ফরয করা হয়েছে (ইচ্ছাকৃতভাবে) যাদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে। (প্রত্যেক) স্বাধীন ব্যক্তি (মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে) নিহত স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, (এমনি-ভাবে প্রত্যেক) দাস (নিহত) দাসের বিনিময়ে এবং (অনুরূপভাবে প্রতিটি) স্ত্রীলোক (নিহত) স্ত্রীলোকের বদলায়। (হত্যাকারী যদি বড় পদমর্যাদাসম্পন্ন এবং নিহত ব্যক্তি যদি ছোটও হয়, তবুও প্রত্যেকের তরফ থেকে সমান কিসাস বা বদলা নেওয়া হবে। অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যার দণ্ডস্বরূপ হত্যা করা হবে) অবশ্য যদি (হত্যাকারীকে) তার প্রতিপক্ষের তরফ থেকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয় (কিন্তু পুরোপুরিভাবে মাফ করা না হয়) তবে (সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেতে পারে। কিন্তু রক্তের বদলাস্বরূপ 'দিয়াত' অর্থাৎ নির্ধারিত পরিমাণ আর্থিক জরিমানা হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের উপরই দু'টি বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরী। প্রথমত নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের পক্ষে সঙ্গত উপায়ে (সে মালের) দাবী পূরণ করবে (অর্থাৎ ক্ষমার পর আর হত্যাকারীকে অতিরিক্ত বিব্রত করবে না) এবং (ভালভাবে নির্ধারিত অর্থ) তার (বাদীর নিকট পৌঁছে দেবে অর্থাৎ পরিমাণে যেন কম না দাও কিংবা অনর্থক যেন টালবাহানা না কর।) এটা (ক্ষমা ও ক্ষতিপূরণ দানের বিধান---) তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে (শাস্তির ক্ষেত্রে) সহজ পন্থা এবং (বিশেষ) অনুগ্রহ। (অন্যথায়, মৃত্যুদণ্ড ভোগ করা ছাড়া আর কোন পন্থাই থাকতো না)। অতঃপর যে ব্যক্তি এর (এ বিধানের) পর সীমালংঘনের অপরাধে অপরাধী হয় (যেমন কারো প্রতি হত্যার মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে অথবা ক্ষমা করে দেওয়ার পরও প্রতিশোধ গ্রহণ করার চেষ্টা করে, আখেরাতে) সে লোকের অত্যন্ত কঠিন শাস্তি হবে। জেনে রেখো, কিসাসের (এই বিধানের) মাঝে তোমাদের জীবনের বিশেষ নিরাপত্তা রয়েছে। (কেননা, এই কঠোর আইনের ভয়ে হত্যার অপরাধ সংঘটন করতে

গিয়ে মানুষ ভয় পাবে। এতে বহু জীবন রক্ষা পাবে)। আশা করা যায়, তোমরা (এমন শাস্তির আইন লংঘন করার ব্যাপারে) সাবধানতা অবলম্বন করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قِصَاصٌ (কিসাসুন)-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যতটুকু জুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশী কিছু করা জায়েয নয়। এ সূরারই পরবর্তী এক আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

অনুরূপ সূরা নাহ্‌লের শেষ আয়াতে রয়েছে ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ০

এতে আলোচ্য বিষয়েই আরো বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সেমতে শরীয়তের পরিভাষায় 'কিসাস' বলা হয় হত্যা এবং আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়।

মাস'আলা ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছুর দ্বারা হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করা, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয়। 'কিসাস' অর্থাৎ 'জানের বদলায় জান' এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মাস'আলা ঃ এ ধরনের হত্যার অপরাধে যেমন স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারী অন্য স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, তেমনি কোন ক্রীতদাসের বদলায়ও স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। অনুরূপ স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোককেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

এ আয়াতে স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকের বদলায় স্ত্রী লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার যে কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা সেই একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

ইবনে-কাসীর ইবনে-আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামী যমানার কিছু আগে দু'টি আরব গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী এক সংঘর্ষ ঘটে। এতে নারী-পুরুষ এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসসহ বহু লোক নিহত হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে এ বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই ইসলামী যমানা শুরু হয়ে যায় এবং এ দু'টি গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণ করার পর উভয় গোত্রের লোকেরা স্ব স্ব গোত্রের নিহত ব্যক্তিদের কিসাস গ্রহণ করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শুরু করে। উভয়ের মধ্যে যে গোত্রটি প্রবল ছিল, তারা দাবী করে বসে, যে পর্যন্ত আমাদের নিহত নারী, পুরুষ ও ক্রীতদাসদের বদলায় তোমাদের এক একজন স্বাধীন পুরুষকে

হত্যা করা না হবে, সে পর্যন্ত আমরা কোন মীমাংসায় সম্মত হব না। ওদের সে জাহিলিয়ত-সুলভ দাবীর অসারতা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই এ আয়াত নাযিল হয়।—"স্বাধীন পুরুষের বদলায় স্বাধীন পুরুষ, গোলামের বদলায় গোলাম এবং নারীর বদলায় নারী"—এ বিধান দিয়ে ওদের সে দাবীকেই খণ্ডন করা হয়েছে যে, হত্যাকারী হোক আর নাই হোক একজন গোলামের বদলায় স্বাধীন পুরুষকে এবং একজন নারীর বদলায় পুরুষকে হত্যা করার এ দাবী গ্রহণীয় হতে পারে না। ইসলাম যে ন্যায়নীতির প্রবর্তন করেছে তাতে একমাত্র হত্যাকারীকে হত্যার বদলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। হত্যাকারিণী যদি নারী হয়ে থাকে, তবে তার বদলায় কোন নিরপরাধ পুরুষকে হত্যা করা কিংবা হত্যাকারী যদি গোলাম হয়ে থাকে, তবে তার বদলায় কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা এক বিরাট জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। এটা ইসলামী সমাজে কোন অবস্থাতেই সহ্য করা হবে না।

আয়াতের মর্মার্থ এটাই সাব্যস্ত হয় যে, যে ব্যক্তি হত্যা করেছে, কেবল সে-ই কিসাসে দণ্ডিত হবে। হত্যাকারী গোলাম বা স্ত্রীলোকের স্থলে নিরপরাধ স্বাধীন পুরুষকে দণ্ডিত করা জায়েয নয়।

অনুরূপ এটাও আয়াতের অর্থ নয় যে, যদি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করে কিংবা কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন ক্রীতদাসকে হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তবে কিসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করা যাবে না। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে 'মৃতের ব্যাপারে কিসাস' শব্দের ব্যবহার এবং অন্য আয়াতে ঃ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ অর্থাৎ 'জানের বদলা জান'—বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

মাস'আলা ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেওয়া হয়,—যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মাত্র দুই পুত্র, সে দু'জনেই যদি মাফ করে দেয়, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পূর্ণ মাফ না হয় অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্রে এক পুত্র মাফ করে, কিন্তু উপর পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কিসাস-এর দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়াত প্রদান করতে হবে।

শরীয়তের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়াত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ' উট অথবা এক হাজার দীনার কিংবা দশ হাজার দিরহাম। বর্তমানকালের প্রচলিত ওজন অনুপাতে এক দিরহাম—সাড়ে তিন মাসা রৌপ্যের পরিমাণ। সেমতে পূর্ণ দিয়াত-এর পরিমাণ হবে দু'হাজার নয়শ' তোলা আট মাসা রৌপ্য।

মাস'আলা ঃ কিসাস-এর আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়াত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয় পক্ষ যদি কোন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপোস-নিষ্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও 'কিসাস' মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফিকাহ্র কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

মাস'আলা ঃ নিহত ব্যক্তির যে ক'জন ওয়ারিস্ থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই 'মীরাস্'-এর অংশ অনুপাতে 'কিসাস' ও দিয়াত-এর মালিক হবে এবং দিয়াত হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ 'মীরাস'-এর অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে। তবে কিসাস যেহেতু বন্টনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনও যদি কিসাস-এর দাবী ত্যাগ করে তবে আর তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না ; বরং দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই অংশ অনুযায়ী দিয়াতের ভাগ পাবে।

মাস'আলা ঃ 'কিসাস' গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন্ অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন্ অবস্থায় হয় না—এ সম্পর্কিত অনেক সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এজন্য আলেম ও ফিকহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 'কিসাস'-এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে।—(কুরতুবী)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ
الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ
خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

(১৮০) তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু শোনেন ও জানেন। (১৮১) যদি কেউ ওসীয়ত শোনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে

তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে। (১৮২) যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন গোনাহ্ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

وصيت—শাব্দিক অর্থে যে কোন কাজ করার নির্দেশ প্রদানকে ওসীয়ত বলা হয়। পরিভাষায়, ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর পরে সম্পাদন করার জন্য মৃত্যুকালে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, তাকেই ওসীয়ত বলা হয়।

خير—শব্দের অনেকগুলো অর্থের মধ্যে এক অর্থ ধন-সম্পদ। যেমন, কোর-আনে উল্লিখিত হয়েছে ঃ ০ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ এখানে মুফাসসিরগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী خير অর্থ ধন-সম্পদ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যতদিন পর্যন্ত ওয়ারিসগণের অংশ কোরআনের আয়াত দ্বারা নির্ধারিত হয়নি, ততদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল মৃত্যুপথযাত্রী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসীয়ত করে যেতেন। অবশিষ্ট সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে বন্টিত হতো। সে নির্দেশটিই এ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন ঃ

তোমাদের উপর ফরয করা হচ্ছে, যখন কারো (লক্ষণাদির দ্বারা) মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হয়, অবশ্য যদি সে কিছু সম্পদ পরিত্যক্ত হিসাবে রেখে যায় (নিজের) পিতামাতা ও (অন্যান্য) নিকট-আত্মীয়ের জন্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে (মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশী যেন না হয়) কিছু যেন বলে যায় (এরই নাম ওসীয়ত) যাদের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় রয়েছে তাদের পক্ষে এটা জরুরী (করা হচ্ছে)। অতঃপর (যেসব লোক ওসীয়ত শুনেছে, তাদের মধ্য থেকে) যে কেউ সেটা (ওসীয়তের বিষয়বস্তু) পরিবর্তন করবে (এবং বন্টনের সময় মিথ্যা যবানবন্দী করে এবং তার সে যবানবন্দী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে যদি কারো কোন হক নষ্ট হয়) তবে সে (হক বিনষ্ট হওয়ার) গোনাহ্ তাদের উপরই পতিত হবে, যারা (বিষয়বস্তু) পরিবর্তন করবে (বিচারক, সালিস কিংবা মৃত ব্যক্তির কোন গোনাহ্ হবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তো নিশ্চিতই সবকিছু জানেন, শোনেন। (তিনি পরিবর্তনকারীর কারসাজি সম্পর্কেও জানেন, সালিস-বিচারকগণ যে নির্দোষ একথাও জানেন।) তবে হাঁ, (এক ধরনের পরিবর্তনের অনুমতি রয়েছে, তা হচ্ছে) যে ব্যক্তি ওসীয়তকারীর তরফ থেকে (ওসীয়তের ব্যাপারে) কোন ভুল সিদ্ধান্ত অথবা (ইচ্ছাকৃতভাবে ওসীয়ত-সম্পর্কিত কোন বিধানের খেলাফ) কোন অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, (আর বিধানের খেলাফ

করার কারণে যদি ওসীয়তকারীর ওয়ারিসদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় কিংবা আশংকা দেখা দেয়) আর সে ব্যক্তি যদি তাদের মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি করে দেয়, তবে বাহ্যত তা ওসীয়ত পরিবর্তন বলে মনে হলেও, সে ব্যক্তির উপর কোন গোনাহ্ হবে না (এবং) সুনিশ্চিতরূপেই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাকারী এবং (গোনাহ্গারদের প্রতিও) অনুগ্রহশীল। (বস্তুত সে ব্যক্তি তো কোন গোনাহ্ করেনি। ওসীয়তের পরিবর্তন মীমাংসার উদ্দেশ্যেই করেছে, সুতরাং তার প্রতি অনুগ্রহ কেন হবে না)?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি (যদি সে কিছু ধন-সম্পদ রেখে যায়,) যে ওসীয়ত ফরয করা হয়েছে, সে নির্দেশের তিনটি অংশ রয়েছে ঃ

(এক) মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের কোন অংশ যেহেতু নির্ধারিত নেই, সুতরাং তাদের হক মৃত ব্যক্তির ওসীয়তের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

(দুই) এ ধরনের নিকটাত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির উপর ফরয।

(তিন) এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশী ওসীয়ত করা জায়েয নয়।

উপরোক্ত তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে 'মীরাস'-এর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 'মনসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে। ইবনে কাসীর ও হাকেম প্রমুখ সহীহ্ সনদের সাথে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে ওসীয়ত-সম্পর্কিত এ নির্দেশটি মীরাস-এর আয়াত দ্বারা রহিত করে দেওয়া হয়েছে। মীরাস-সম্পর্কিত আয়াতটি হচ্ছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ - وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ○

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মীরাসের আয়াত সে সমস্ত আত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করা রহিত করে দিয়েছে, যাদের মীরাস নির্ধারিত হয়েছিল। এ ছাড়া অন্য যেসব আত্মীয়ের অংশ মীরাসের আয়াতে নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়ত করার হুকুম এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।

——(জাস্সাস, কুরতুবী)

তবে আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের জন্য মীরাসের আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রীর

পক্ষে ফরয বা জরুরী নয়। সে ফরয রহিত হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন বিশেষে এটা মুস্তাহাবে পরিণত হয়েছে। —(জাস্‌সাস, কুরতুবী)

দ্বিতীয় নির্দেশ

ওসীয়ত ফরয হওয়া প্রসঙ্গেঃ ওসীয়ত সম্পর্কিত এ আয়াতের নির্দেশ একাধারে যেমন কোরআনের মীরাস সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে, তেমনি বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশের মাধ্যমেও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। বিদায় হজ্জের বিখ্যাত খোতবায় রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছিলেন ঃ

ان الله اعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ٥ اخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن ٥

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে কোন ওয়ারিসের পক্ষে ওসীয়ত করা জায়েয নয়।—(তিরমিযী)

একই হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাও যুক্ত হয়েছে ঃ

لا وصية لوارث الا ان تجيز الورثة ٥

"কোন ওয়ারিসের জন্য সে পর্যন্ত ওসীয়ত জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত অন্য ওয়ারিসগণ অনুমতি না দেয়।" —(জাস্‌সাস)

হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই যেহেতু প্রত্যেক ওয়ারিসের হিস্‌সা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং এখন আর ওসীয়ত করার অনুমতি নেই। তবে যদি অন্য ওয়ারিসগণ ওসীয়ত করার অনুমতি দেন, তবে যে কোন ওয়ারিসের জন্য বিশেষভাবে কোন ওসীয়ত করা জায়েয হবে।

ইমাম জাস্‌সাস বলেন, এ হাদীসটি বহু সংখ্যক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত এবং উম্মতের ফকীহ্‌গণ সর্বসম্মতিক্রমে এটি গ্রহণ করেছেন। ফলে এটি 'মুতাওয়াতের' বা বহুল বর্ণিত হাদীসের পর্যায়ভুক্ত, যে হাদীস দ্বারা কোরআনের আয়াতের হুকুম রহিত করাও জায়েয।

ইমাম কুরতুবী বলেন, উম্মতের আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস, যথাঃ মুতাওয়াতের ও মশহুর বর্ণনা, কোরআনেরই সমপর্যায়ের। কেননা সেটিও আল্লাহ্ তা'আলারই ফরমান। এ ধরনের হাদীস দ্বারা কোরআনের কোন নির্দেশ রহিত হওয়াতে কোন দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ নেই।

অতঃপর বলেন, সংশ্লিষ্ট হাদীস যদি আমাদের নিকট 'খবরে-ওয়াহেদ' বা এক ব্যক্তির বর্ণনার মাধ্যমেও পৌঁছে, তবু তাতে সংশয়ের কারণ নেই। পক্ষান্তরে বিদায়

হজ্জের বিরাট সমাবেশে এক লাখেরও বেশী সাহাবীর উপস্থিতিতে সে সম্পর্কে হুযুর (সা)-এর ঘোষণা প্রদানের ফলে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি সম্পর্কে সাহাবী এবং পরবর্তী পর্যায়ে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এ হাদীস তাদের নিকট অকাট্য দলীল হিসাবে গৃহীত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যথায় কোরআনের আয়াতের মোকাবিলায় এ সম্পর্কে তাঁদের পক্ষে ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভবপর হতো না।

তৃতীয় নির্দেশ

এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের ওসীয়ত সম্পর্কে ঃ আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তার মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওসীয়ত করা জায়েয। এমন কি উত্তরাধিকারিগণের অনুমতিক্রমে সমগ্র সম্পত্তিও ওসীয়ত করা জায়েয এবং গ্রহণযোগ্য।

মাস'আলা ঃ উপরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হচ্ছে যে, যেসব আত্মীয়ের হিস্সা কোরআনে করীম নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের জন্য ওসীয়ত করা ওয়াজিব নয়। এমন কি ওয়ারিসগণের অনুমতি ব্যতীত এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের অতিরিক্ত ওসীয়ত করা জায়েযই নয়। তবে যেসব আত্মীয়ের হিস্সা কোরআন নির্ধারণ করেনি, তাদের জন্য মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণের মধ্যে ওসীয়ত করার অনুমতি রয়েছে।

মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পক্ষে সাধারণভাবে তার সম্পত্তির ব্যাপারে ওসীয়ত করার বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির উপর অন্যের ঋণ বা আমানত থাকে এবং তা পরিশোধ করার জন্য তার সমগ্র সম্পত্তিও ওসীয়ত করতে হয়, তবুও তার পক্ষে তা করতে হবে এবং সমস্ত সম্পত্তির ওসীয়তই বৈধ হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন—কারো উপর অন্যের হক থাকলে তার পক্ষে সে সম্পর্কে লিখিত ওসীয়ত করা ব্যতীত তিনটি রাতও কাটানো উচিত নয়।

মাস'আলা ঃ এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসীয়ত করার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেরূপ ওসীয়ত করার পর জীবতাবস্থায় তা পরিবর্তন কিংবা বাতিল করে দেওয়ারও অধিকার রয়েছে।—(জাস্সাস)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ

تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

(১৮৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। (১৮৪) গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোযা রাখ তবে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতিসমূহের) লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিল, এই আশায় যেন তোমরা (রোযার কল্যাণে ধীরে ধীরে) পরহেযগার হতে পারে। (কেননা রোযা রাখার ফলে নফস্‌কে তার বিভিন্নমুখী প্রবণতা থেকে সংযত রাখার অভ্যাস গড়ে উঠবে, আর এ অভ্যাসের দৃঢ়তাই হবে পরহেযগারীর ভিত্তি। সুতরাং) গণনার কয়েকটা দিন রোযা রাখ। (এ অল্প কয়টি দিনের অর্থ—রমযান মাস, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।) অতঃপর (এর মধ্যেও এমন সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে,) তোমাদের মধ্যে যারা (এমন) অসুস্থ হয়, (যার পক্ষে রোযা রাখা কঠিন কিংবা ক্ষতিকর হতে পারে) অথবা (শরীয়তসম্মত) সফরে থাকে, (তার পক্ষে রমযান মাসে রোযা না রাখারও অনুমতি রয়েছে এবং রমযান ছাড়া) অন্যান্য সময়ে (ততগুলো দিন) গণনা করে রোযা রাখা (তার উপর ওয়াজিব)। আর (দ্বিতীয় সহজ পদ্ধতিটি, যা পরে রহিত হয়ে গেছে, তা এরূপ যে,) এ রোযা যাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর মনে হয় তারা এর পরিবর্তে (শুধু রোযার) 'ফিদইয়া' (অর্থাৎ বদলা) হিসাবে একজন দরিদ্রকে খাদ্য খাওয়াবে (অথবা দিয়ে দেবে)। তবে যে ব্যক্তি খুশীর সাথে (আরো বেশী) খয়রাত করে (অর্থাৎ আরো বেশী ফিদ্‌ইয়া দিয়ে দেয়) তবে তা তার জন্য আরো বেশী মঙ্গল-কর হবে এবং (যদিও আমি এরূপ অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছি, কিন্তু এ অবস্থাতেও) তোমাদের পক্ষে রোযা রাখা অনেক বেশী কল্যাণকর, যদি তোমরা (রোযার ফযীলত সম্পর্কে) জানতে পার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

صوم-এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা বা বেঁচে থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম 'সওম'। তবে সুবেহ্-সাদেক হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা রোযা বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও যদি কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে কিংবা সহবাস করে, তবে রোযা হবে না। অনুরূপ উপায়ে সব কিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি রোযার নিয়ত না থাকে তবে তা রোযা হবে না।

সওম বা রোযা ইসলামের মূল ভিত্তি বা আরকানের অন্যতম। রোযার অপরিসীম ফযীলত রয়েছে, যা এখানে বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক।

পূর্ববর্তী উম্মতের উপর রোযার হুকুম ঃ মুসলমানদের প্রতি রোযা ফরয হওয়ার নির্দেশটি একটি বিশেষ নযীর উল্লেখসহ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোযা শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল। এর দ্বারা যেমন রোযার বিশেষ গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে, তেমনি মুসলমানদের এ মর্মে একটা সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে যে, রোযা একটা কষ্টকর ইবাদত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরয করা হয়েছিল। কেননা সাধারণত দেখা যায়, কোন একটা ক্লেশকর কাজে অনেক লোক একই সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে মনে হয়। —(রূহুল মা'আনী)

কোরআনের বাক্য الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ—অর্থাৎ যারা তোমাদের পূর্বে ছিল ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সকল উম্মত এবং শরীয়তকেই বোঝায়। এতে বোঝা যায় যে, নামাযের ইবাদত থেকে যেমন কোন উম্মত বা শরীয়তই বাদ ছিল না, তেমনি রোযাও সবার জন্যই ফরয ছিল।

যাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, مِنْ قَبْلِكُمْ বাক্য দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মত 'নাসারা'দের বোঝানো হয়েছে, তাঁরা বলেন—এটা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে; অন্যান্য উম্মতের উপর রোযা ফরয ছিল না, তাঁদের কথায় এ তথ্য বোঝায় না। —(রূহুল-মা'আনী)

আয়াতের মধ্যে শুধু বলা হয়েছে যে, "রোযা যেমন মুসলমানদের উপর ফরয করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল; একথা দ্বারা এ তথ্য বোঝায় না যে, আগেকার উম্মতগণের রোযা সমগ্র শর্ত ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মুসলমানদের উপর ফরযকৃত রোযারই অনুরূপ ছিল। যেমন রোযার সময়সীমা,

সংখ্যা এবং কখন তা রাখা হবে এসব ব্যাপারে আগেকার উম্মতদের রোযার সাথে মুসলমানদের রোযার পার্থক্য হতে পারে. বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। বিভিন্ন সময়ে রোযার সময়সীমা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে। —(রূহুল-মা'আনী)

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ—বাক্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, 'তাকওয়া' বা পরহেযগারীর শক্তি অর্জন করার ব্যাপারে রোযার একটা বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা রোযার মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। প্রকৃত-প্রস্তাবে সেটাই 'তাকওয়া' বা পরহেযগারীর ভিত্তি।

রুগ্ন ব্যক্তির রোযা ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا—বাক্যে উল্লিখিত রুগ্ন' সে ব্যক্তিকে বোঝায়, রোযা রাখতে যার কঠিন কষ্ট হয় অথবা রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। পরবর্তী আয়াত وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ-এর মধ্যে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে। ফিকহ্‌বিদ আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত তা-ই।

মুসাফিরের রোযা ঃ আয়াতের অংশ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ-এর মধ্যে مسافر না বলে عَلَىٰ سَفَرٍ শব্দ ব্যবহার করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রথমত শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থের সফর, যথা ঃ বাড়ীঘর থেকে বের হয়ে কোথাও গেলেই রোযার ব্যাপারে সফরজনিত 'রুখসত' (অব্যাহতি) পাওয়া যাবে না, সফর দীর্ঘ হতে হবে। কেননা عَلَىٰ سَفَرٍ শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে, যে সফরের উপরে থাকে। এতে বোঝা যায় যে, বাড়ীঘর থেকে পাঁচ-দশ মাইল দূরে গেলেই তা সফর বলে গণ্য হবে না। তবে সফর কতটুকু দীর্ঘ হতে হবে, সে সীমারেখা কোরআনে উল্লিখিত হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস এবং সাহাবীগণের আমলের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অন্যান্য কিছু সংখ্যক ফিকহ্‌বিদের মতে ঐ সফর কমপক্ষে তিন মন্‌যিল দূরত্বের হতে হবে। অর্থাৎ একজন লোক স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে তিনদিন যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে ততটুকু দূরত্বের সফরকে সফর বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগের আলেমগণ 'মাইল'-এর হিসাবে এ দূরত্ব আটচল্লিশ মাইল নির্ধারণ করেছেন।

দ্বিতীয় মাস'আলা ঃ عَلَىٰ سَفَرٍ শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, মুসাফির -এর প্রতি রোযার ব্যাপারে সফরজনিত 'রুখসত' ততক্ষণই প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ

পর্যন্ত সে সফরের মধ্যে থাকে। তবে স্বভাবতই সফর চলা অবস্থায় কোথাও সাময়িক যাত্রাবিরতি সফরের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটায় না। নবী করীম (সা)-এর হাদীস মতে এ যাত্রাবিরতির মেয়াদ উর্ধ্বপক্ষে পনের দিনের কম সময় হতে হবে। কেউ যদি সফরের মধ্যেই কোথাও পনের দিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে সে আর 'সফরের মধ্যে' থাকে না। ফলে সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সফরজনিত 'রুখসত' প্রযোজ্য হবে না।

মাস'আলা ঃ একই বাক্যাংশ দ্বারা এ কথাও বোঝায় যে, কেউ যদি সফরের মধ্যে কোন এক জায়গায় নয়, বরং বিভিন্ন জায়গায় মোট পনের দিনের যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তার সফরের ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে না। সে সফরজনিত রুখসত পাওয়ার অধিকারী হবে।

রোযার কাযা ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ অর্থাৎ রুগ্ন বা মুসাফির ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় কিংবা সফরে যে কয়টি রোযা রাখতে পারবে না, সেগুলো অন্য সময় হিসাব করে কাযা করা ওয়াজিব। এতে বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের অসুবিধায় পতিত হয়ে যে ক'টি রোযা ছাড়তে হয়েছে, সে ক'টি রোযা অন্য সময় পূরণ করে দেওয়া তাদের উপর ওয়াজিব। এ কথাটি বোঝানোর জন্য فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ (তার উপর কাযা ওয়াজিব,) এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তা না বলে فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রুগ্ন এবং মুসাফিরদের অপরিহার্য রোযার মধ্যে শুধু সে পরিমাণ রোযার কাযা করাই ওয়াজিব, রুগী সুস্থ হওয়ার পর এবং মুসাফির বাড়ী ফেরার পর যে কয়দিনের সুযোগ পাবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি এতটুকু সময় না পায় এবং এর আগেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তার উপর কাযা কিংবা 'ফিদ্‌ইয়া'র জন্য ওসীয়ত করা জরুরী নয়।

মাস'আলা عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ বাক্যে যেহেতু এমন কোন শর্তের উল্লেখ নেই, যদ্দ্বারা বোঝা যেতে পারে যে, এ রোযা একই সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে, না মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রাখলেও চলবে, সুতরাং যার রমযানের প্রথম দশ দিনের রোযা ফউত হয়েছে সে যদি প্রথমে দশ তারিখের কাযা করে, পরে নয় তারিখের তারপর আট তারিখের কাযা হিসাবে করতে থাকে, তবে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। অনুরূপভাবে দশটি রোযার মধ্যে দু'চারটি করার পর বিরতি দিয়ে দিয়ে অবশিষ্টগুলো কাযা করলেও কোন অসুবিধা হবে না। কেননা আয়াতের মধ্যে এরূপভাবে কাযা করার ব্যাপারেও কোন নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হয়নি।

রোযার ফিদ্‌ইয়া ঃ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ—আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ দাঁড়ায় যেসব লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়, বরং রোযা রাখার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তাদের জন্যও রোযা না রেখে রোযার বদলায় 'ফিদ্‌ইয়া' দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেওয়া হয়েছে যে, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ রোযা রাখাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

উপরোক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে রোযায় অভ্যস্ত করে তোলা। এরপর অবতীর্ণ আয়াত فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এর দ্বারা প্রাথমিক এ নির্দেশ সুস্থ-সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তবে যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অপারক কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে সেসব লোকের বেলায় উপরোক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই।----(জাসসাস, মাযহারী)

বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসের সমস্ত ইমাম-গণই সাহাবী হযরত সালামা-ইবনুল্ আকওয়া (রা)-র সে বিখ্যাত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, যখন وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে রোযা রাখতে পারে এবং যে রোযা রাখতে না চায়, সে 'ফিদ্‌ইয়া' দিয়ে দেবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ নাযিল হল, তখন রোযা অথবা 'ফিদ্‌ইয়া' দেওয়ার ইখতিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ-সমর্থ লোকদের উপর শুধুমাত্র রোযা রাখাই জরুরী সাব্যস্ত হয়ে গেল।

মসনদে আহমদে উদ্ধৃত হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইসলামের প্রথম অবস্থায় নামাযের নির্দেশের বেলায় তিনটি স্তর অতিক্রান্ত হয়েছে; রোযার ব্যাপারেও অনুরূপ তিনটি স্তর অতিক্রান্ত হয়। রোযার নির্দেশ-সংক্রান্ত তিনটি স্তর হচ্ছে এরূপ ঃ

---"হুযুর (সা) যখন মদীনায় আসেন তখন প্রতি মাসে তিনটি এবং আশুরার দিনে একটি রোযা রাখতেন। এরপর রোযা ফরয হওয়া সংক্রান্ত আয়াত

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ নাযিল হয়। এ অবস্থায় সবারই ইখতিয়ার ছিল যে, কেউ রোযাও রাখতে পারত অথবা তার বদলায় 'ফিদ্ইয়া'ও প্রদান করতে পারত। তবে তখনো রোযা রাখাই উত্তম বিবেচিত হত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিতীয় আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ নাযিল করলেন। এ আয়াত সুস্থ-সবল লোকদের এ ইখতিয়ার 'রহিত করে' তাদের জন্য শুধুমাত্র রোযার বিধানই প্রবর্তন করে। তবে অতি বৃদ্ধ লোকদের বেলায় সে ইখতিয়ার অবশিষ্ট রাখা হয়েছে তারা ইচ্ছা করলে এখনো রোযা না রেখে 'ফিদ্ইয়া' দিয়ে দিতে পারে।

তৃতীয় পরিবর্তন হয়েছে যে, প্রথমাবস্থায় ইফতারের পর থেকে শয্যা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা এবং যৌনক্ষুধা মেটানোর অনুমতি ছিল। কিন্তু বিছানায় গিয়ে একবার ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় দিনের রোযা শুরু হয়ে যেতো। এরপর ঘুম ভাঙ্গলে রাত থাকা সত্ত্বেও খানাপিনা কিংবা স্ত্রী সম্ভোগের অনুমতি ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ শীর্ষক আয়াত নাযিল করে সুবেহ সাদেক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনা প্রভৃতি সবকিছুই চলতে পারে—এরূপ অনুমতি দিয়েছেন। এমন কি এরপর থেকে শেষ রাত্রে উঠে সেহ্রী খাওয়া সুন্নত করে দিয়েছেন। বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ প্রভৃতিতেও একই মর্মে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

---(ইবনে কাসীর)

ফিদ্ইয়ার পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক মাস'আলা ঃ একটি রোযার ফিদ্ইয়া অর্ধ সা' গম অথবা তার মূল্য। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলার সের হিসাবে অর্ধ সা' পৌনে দু'সেরের কাছাকাছি হয়। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী তার মূল্য কোন মিসকীনকে দান করে দিলেই একটি রোযার 'ফিদ্ইয়া' আদায় হয়ে যায়। ফিদ্ইয়া কোন মসজিদ বা মাদ্রাসায় কার্যরত কোন লোকের খেদমতের পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া জায়েয নয়।

মাস'আলা ঃ এক রোযার ফিদ্ইয়া একাধিক মিসকীনকে দেওয়া অথবা একাধিক রোযার ফিদ্ইয়া একই সাথে এক ব্যক্তিকে দেওয়া দুরস্ত নয়। শামী, বাহ্রুর রায়েক-এর হাওয়ালায় এমনই বর্ণনা করেছেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) বয়ানুল-কোরআনেও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এমদাদুল ফতওয়াতে থানবী (র) লিখেছেন যে, ফতওয়া হচ্ছে এক রোযার ফিদ্ইয়া একাধিক মিসকীনকে দেওয়া এবং একাধিক রোযার ফিদ্ইয়া এক মিসকীনকে দেওয়া---এ উভয় সুরতই জায়েয। শামীতেও অনুরূপ ফতওয়া রয়েছে। এমদাদুল ফতওয়াতে অবশ্য বলা হয়েছে যে, একাধিক রোযার ফিদ্ইয়া একই সময়ে এক ব্যক্তিকে না দেওয়াই উত্তম। তবে কেউ দিয়ে দিলে তা আদায় হয়ে যাবে।

মাস'আলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে 'ফিদ্ইয়া' প্রদান করার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে ব্যক্তি ইস্তেগফার পড়তে থাকবে এবং মনে মনে নিয়ত করবে যে, সমর্থ হলে পরই তা আদায় করে দেবে।---(বয়ানুল-কোরআন)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ
اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(১৮৫) রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না—যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

রোযার দিন নির্দিষ্টকরণ ঃ উপরে বলা হয়েছিল যে, সামান্য কয়েক দিন তোমাদের রোযা রাখতে হবে। সে সামান্য কয়েক দিনের বিষয়ই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

(সে সামান্য কয়েক দিন যাতে রোযা রাখার হুকুম করা হয়েছে, তা হল) রমযান মাস, যাতে এমন বরকত বিদ্যমান রয়েছে যে, এরই এক বিশেষ অংশে (অর্থাৎ শবে-কদরে) কোরআন মজীদ (লওহে মাহ্ফুয থেকে দুনিয়ার আকাশে) পাঠানো হয়েছে। তার (একটি) বৈশিষ্ট্য এই যে, (এটা) মানুষের জন্য হেদায়েতের উপায় এবং (অপর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, হেদায়েতের পন্থা বাতলাবার জন্যও এর প্রতিটি অংশ) প্রমাণস্বরূপ। (আর এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে এটাও মূলত সেসব আসমানী কিতাবেরই অনুরূপ, যেগুলো এসব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত অর্থাৎ) হেদায়েত তো বটেই তৎসঙ্গে (যে কোন বিষয়ের উপর প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থাপনকারী হওয়ার দরুন) সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বিধানকারীও বটে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যেসব

লোক এ মাসে বিদ্যমান থাকবে, তাদের জন্য রোযা রাখা অপরিহার্য কর্তব্য। (এতে 'ফিদ্ইয়া' বা বদলার যে অনুমতির কথা উপরে বলা হয়েছিল তা রহিত হয়ে গেল। তবে অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য যে আইন ছিল অবশ্য এখনও তেমনিভাবে তা বলবৎ রয়েছে যে) যে, লোক (এমন) রোগাক্রান্ত (বা অসুস্থ) হবে, (যাতে রোযা রাখা কঠিন কিংবা ক্ষতিকর) অথবা (যে লোক শরীয়তসম্মত) সফরে থাকবে, (তার জন্য রমযান মাসে রোযা না রাখারও অনুমতি রয়েছে এবং রমযানের দিনসমূহের পরিবর্তে অন্য মাসের (তত দিন) গুণে রোযা রাখা ওয়াজিব। আল্লাহ্ তা'আলা (হুকুম আহ্কামের ব্যাপারে) তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতে চান। (কাজেই তিনি এমন আহ্কামই নির্ধারণ করেছেন, যা তোমরা সহজভাবে সম্পাদন করতে পার। সুতরাং সফর ও অসুস্থতার সময়ের জন্য এমন সহজ আইন সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া) তিনি তোমাদের সাথে (হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুনের ব্যাপারে কোন রকম) জটিলতা সৃষ্টি করতে চান না। বস্তুত (উল্লিখিত হুকুম-আহকামও আমি বিভিন্ন তাৎপর্যের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করেছি। কাজেই প্রথমত নির্ধারিত সময়ে রোযা রাখার এবং কোন বিশেষ ওযর থাকলে সে রোযাগুলো অন্য দিনে কাযা করে নেওয়ার হুকুমও সে ভিত্তিতেই দেওয়া হয়েছে,) যাতে তোমরা (নির্ধারিত দিনের কিংবা কাযার) দিনের গণনা সম্পূর্ণ করে নিতে পার (এবং যাতে সওয়াবের কোন কমতি না থাকে)। আর কাযার হুকুমও এজন্য করা হয়েছে, যাতে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব (কীর্তন) কর (এ কারণে যে, তিনি তোমাদিগকে এমন এক পন্থা বাতলে দিয়েছেন, যাতে তোমরা রোযার দিনের বরকত ও ফল লাভে বঞ্চিত না হও। পক্ষান্তরে কাযা করা যদি ওয়াজিব না হত, তবে কে এসব রোযা রেখে পরিপূর্ণ সওয়াব অর্জন করতে পারত?) আর (ওযরের কারণে বিশেষভাবে রমযানে রোযা না রাখার অনুমতি এজন্য দেওয়া হয়েছে) যাতে তোমরা (এই সহজ করে দেওয়ার কারণে) আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় কর (এ অনুমতি যদি না হত, তবে সে বিষয়টি আদায় করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে পড়ত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে পূর্ববর্তী সংক্ষিপ্ত আয়াতের বিশ্লেষণও করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে রমযান মাসের উচ্চতর ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ বাক্যটি ছিল সংক্ষিপ্ত। তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ আয়াতে যে, সে কতিপয় দিন হল রমযান মাসের দিনগুলো। আর এর ফযীলত হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ মাসটিকে স্বীয় ওহী এবং আসমানী কিতাব নাযিল করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। সুতরাং কোরআনও (প্রথম) এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। মসনদে আহ্মদ গ্রন্থে হযরত ওয়াসেলাহ্ ইবনে আসকা থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা রমযান মাসের ১লা তারিখে নাযিল হয়েছিল। আর রমযানের ৬ তারিখে তওরাত, ১৩ তারিখে ইঞ্জীল এবং ২৪ তারিখে

কোরআন নাযিল হয়েছে। হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, 'যবুর' রমযানের ১২ তারিখে এবং ইঞ্জীল ১৮ তারিখে নাযিল হয়েছে। --(ইবনে-কাসীর)

উল্লিখিত হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অবতরণ সম্পর্কিত যেসব তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব তারিখে সেসব কিতাব গোটাই নাযিল করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোরআনের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তা সম্পূর্ণভাবে রমযানের কোন এক রাতে লওহে-মাহ্‌ফুয থেকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ করে দেওয়া হলেও হুযুর আকরাম (সা)-এর উপর ধীরে ধীরে তেইশ বছরে তা অবতীর্ণ হয়।

রমযানের যে রাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল কোরআনেরই ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা ছিল শবে-কদর। বলা হয়ছে---إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (অবশ্যই আমি তা নাযিল করেছি কদরের রাতে)। উল্লিখিত হাদীসে এ রাতটি ২৪শে রমযানের রাত ছিল বলে বলা হয়েছে। আর হযরত হাসান (রা)-এর মতে ২৪তম রাতটি হল শবে-কদর। এভাবে এ হাদীসটিও কোরআনের আয়াতের অনুরূপ। পক্ষান্তরে যদি এই সামঞ্জস্যকে সমর্থন করা না হয়, তবে কোরআনের ব্যাখ্যাই এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য অর্থাৎ যে রাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছিল, সে রাতই শবে-কদর হবে। এ আয়াতের মর্মও তাই।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ---এই একটি মাত্র বাক্যে রোযা সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকাম ও মাস'আলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। شَهِدَ শব্দটি شُهُود থেকে গঠিত। এর অর্থ উপস্থিতি ও বর্তমান থাকা। আরবী অভিধানে الشَّهْر অর্থ মাস। এখানে অর্থ হল রমযান মাস। কাজেই বাক্যটির অর্থ দাঁড়াল এই যে, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক রমযান মাসে উপস্থিত থাকবে অর্থাৎ বর্তমান থাকবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোযা রাখা কর্তব্য। ইতিপূর্বে রোযার পরিবর্তে ফিদ্‌ইয়া দেওয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল, এ বাক্যের দ্বারা তা মনসূখ বা রহিত করে দিয়ে রোযা রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেওয়া হয়েছে।

রমযান মাসে উপস্থিত বা বর্তমান থাকার মর্ম হল রমযান মাসটিকে এমন অবস্থায় পাওয়া যাতে রোযা রাখার সামর্থ্য থাকে। অর্থাৎ মুসলমান, বুদ্ধিমান, সাবালক, মুকীম এবং হায়েজ-নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় রমযান মাসে বর্তমান থাকা।

সেজন্যই পূর্ণ রমযান মাসটিই যার এমন অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়, যাতে তার রোযা রাখার আদৌ যোগ্যতা থাকে না---যেমন কাফির, নাবালেগ, উন্মাদ প্রভৃতি, তখন সে লোক এই নির্দেশের আওতাভুক্ত হয় না। তাদের উপর রমযানের রোযা ফরয হয় না। পক্ষান্তরে যাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে রোযা রাখার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ ওযরবশত বাধ্য হয়ে রোযা পরিহার করতে হয়, যেমন, স্ত্রীলোকের হায়েয-নেফাসের অবস্থা কিংবা রোগ-শোক অথবা সফর অবস্থা প্রভৃতি। তখনও তাদের

রোযা রাখার যোগ্যতার ক্ষেত্রে রমযান মাসে বর্তমান বলেই গণ্য হবে। কাজেই তাদের উপর আয়াতে বর্ণিত হুকুম বর্তাবে। কিন্তু সাময়িক ওযরবশত সে সময়ের জন্য রোযা মাফ বলে গণ্য হবে। অবশ্য পরে তা কাযা করতে হবে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার জন্য রোযার যোগ্য অবস্থায় রমযান মাসের উপস্থিতি একটা শর্ত। এমতাবস্থায় যে লোক পূর্ণ রমযান মাসকে পাবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোযা ফরয হয়ে যাবে যে লোক এ অবস্থায় কিছু কম সময় পাবে, তার উপর ততদিনই ফরয হবে। কাজেই রমযান মাসের মাঝে যদি কোন কাফির ব্যক্তি মুসলমান হয়, কিংবা কোন নাবালেগ যদি বালেগ হয়, তবে তার উপর পরবর্তী রোযাগুলোই ফরয হবে ; বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য উন্মাদ ব্যক্তি মুসলমান ও বালেগ হওয়ার প্রেক্ষিতে যেহেতু ব্যক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী হয়, সেহেতু সে যদি রমযানের কোন অংশে সুস্থ হয়ে উঠে, তবে এ রমযানের বিগত দিনগুলোর কাযা করাও তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে হায়েযনেফাসগ্রস্ত স্ত্রীলোক যদি রমযানের মাঝে পাক হয়ে যায় অথবা কোন অসুস্থ লোক যদি সুস্থ হয়ে ওঠে কিংবা কোন মুসাফির যদি মুকীম হয়ে যায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করা তার পক্ষে জরুরী হবে।

মাস'আলা ঃ রমযান মাসের উপস্থিতি তিন পন্থায় প্রমাণিত হয়---(১) রমযানের চাঁদ নিজে চোখে দেখা, (২) বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর মাধ্যমে চাঁদ প্রমাণিত হওয়া এবং (৩) এতদুভয় পন্থায় প্রমাণিত না হলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর রযমান মাস আরম্ভ হয়ে যাবে।

মাস'আলা ঃ শাবান মাসের ২৯ তারিখের সন্ধ্যায় যদি মেঘ প্রভৃতির দরুন চাঁদ দেখা না যায় এবং শরীয়তসম্মত কোন সাক্ষীও উপস্থিত না হয়, তাহলে পরবর্তী দিনটিকে বলা হয় يوم الشك (ইয়াওমুশ্‌শক) বা সন্দেহজনক দিন। কারণ এতে প্রকৃতই চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনাও থাকে, কিন্তু চাঁদ দেখার স্থানটি পরিষ্কার না থাকায় তা হয়তো দেখা যায় না। তাছাড়া এদিন চাঁদ আদৌ উদয় না হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এ দিনে যেহেতু চন্দ্রোদয় প্রমাণিত হয় না, কাজেই সেদিনের রোযা রাখাও ওয়াজিব হয় না, বরং তা মক্‌রূহ হয়। ফরয ও নফলের মাঝে যাতে সংমিশ্রণ ঘটতে না পারে সেজন্য হাদীসে এর নিষিদ্ধতা রয়েছে।---(জাস্‌সাস)

মাস'আলা ঃ যেসব দেশে রাত ও দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হয়ে থাকে সেসব দেশে বাহ্যত মাসের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় না অর্থাৎ রমযান মাসের প্রকাশ্য আগমন ঘটে না, কাজেই সে দেশের অধিবাসীদের উপর রোযা ফরয না হওয়াই উচিত। হানাফী মযহাব অবলম্বী ফিকহ্‌বিদগণের মধ্যে হালওয়ানী, কেবালী প্রমুখ নামাযের ব্যাপারেও এমনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, তাদের উপর নিজেদের দিন-রাত অনুযায়ী নামাযের হুকুম বর্তাবে অর্থাৎ যে দেশে মাগরিবের সাথে সাথেই সুবহেসাদেক হয়ে যায়, সেদেশে এশার নামায ফরয হয় না।---(শামী)

এর তাকাদা হল এই যে, যে দেশে ছয় মাসে দিন হয়, সেখানে শুধু পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয হবে; রমযান আদৌ আসবে না। হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-ও 'এমদাদুল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে রোযা সম্পর্কে এ মতই গ্রহণ করেছেন।

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ——আয়াতে রুগ্ন কিংবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে যে, সে তখন রোযা না রেখে বরং সুস্থ হওয়ার পর অথবা সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের রোযা কাযা করে নেবে। এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু রোযার পরিবর্তে ফিদ্ইয়া দেওয়ার ঐচ্ছিকতাকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে, কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয়তো রুগ্ন কিংবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾

(১৮৬) আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে —বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে রমযানের হুকুম-আহ্কাম ও ফযীলতের বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে রোযা ও ই'তিকাফের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে মাঝখানে বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়াতটিকে বান্দাদের অবস্থার প্রতি মহান পরওয়ারদেগারের অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও কবুল করার বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ রোযা-সংক্রান্ত ইবাদতে অবস্থা বিশেষে অব্যাহতি দান এবং বিভিন্ন সহজতা সত্ত্বেও কিছু কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। এ কষ্টকে সহজ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, যখনই তারা আমার

কাছে কোন বিষয় প্রার্থনা বা দোয়া করে, আমি তাদের সে দোয়া কবুল করে নেই এবং তাদের বাসনা পূরণ করে দেই।

এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহ্কাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত কর্তব্য—তাতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা সহ্য করা উচিত। ইমাম ইবনে-কাসীর দোয়ার প্রতি উৎসাহ দান সংক্রান্ত এই মধ্যবর্তী বাক্যটির তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতের দ্বারা রোযা রাখার পর দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্যই রোযার ইফতারের পর দোয়ার ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

للصائم عند فطره دعوة مستجابة

অর্থাৎ রোযার ইফতার করার সময় রোযাদারের দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

—(আবু দাউদ)

সেজন্যই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) ইফতারের সময় বাড়ীর সবাইকে সমবেত করে দোয়া করতেন।

আয়াতের তফসীর হল এই ঃ

আর [হে মুহাম্মদ (সা)]! যখন আপনার কাছে আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (যে, আমি তাদের নিকটে কি দূরে,) তখন (আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলে দিন,) আমি তো নিকটেই রয়েছি। (আর অসঙ্গত প্রার্থনা ছাড়া সমস্ত) প্রার্থনা-কারীর প্রার্থনাই গ্রহণ করে নেই, যখন সে নিবেদন করে আমার দরবারে। সুতরাং (যেভাবে আমি তাদের আবেদন-নিবেদন মঞ্জুর করে নেই, তেমনিভাবে) আমার হুকুম-আহ্কামগুলো (আনুগত্য সহকারে) মেনে নেওয়াও তাদের কর্তব্য। আর যেহেতু আমার সে সমস্ত হুকুম-আহ্কামের কোনটিই অসঙ্গত নয়, সেহেতু তাতে কোন একটিও বাদ দেওয়ার মত নেই। আর (তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন) আমার উপর নিঃসংশয়ে বিশ্বাস রাখে। (অর্থাৎ আমার সত্তাই যে একচ্ছত্র হাকেম সে ব্যাপারেও।) আশা করা যায়, (এভাবে) তারা হেদায়েত ও সরল পথ লাভে সমর্থ হবে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াতে إِنِّي قَرِيبٌ (আমি নিকটেই রয়েছি) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ধীরে-সুস্থে ও নীরবে দোয়া করাই উত্তম, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা পছন্দনীয় নয়। ইমাম ইবনে কাসীর (রা) এ আয়াতের শানে-নুযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, কোন গ্রামের কিছু অধিবাসী রসূলে-করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিল, "যদি আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের নিকটেই থেকে থাকেন, তবে আমরা আস্তে আস্তে দোয়া করব। আর যদি দূরে থেকে থাকেন, তবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকব।" এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।